সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

নভেম্বর ২০১৫

দেখা হল চক্ষু মেলিয়া

রাষ্ট্রপতির সঙ্গে শত তরুণের সাক্ষাৎ

১. ২২ অক্টোবর ২০১৫ দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদের সঙ্গে ভারতীয় হাই কমিশনার পঙ্কজ সরনের সাক্ষাৎ
২. ২৫ অক্টোবর বাংলাদেশের মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে হাই কমিশনারের সাক্ষাৎ
৩. ১৪ অক্টোবর আইটিইসি এবং আইসিসিআর দিবস উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে প্রধান অতিথি বাংলাদেশের বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমদের সঙ্গে হাই কমিশনার
৪. ২৯ অক্টোবর শিলাইদহে রবীন্দ্র কুঠিবাড়িতে বাংলাদেশের সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূরের সঙ্গে হাই কমিশনার
৫. ১৭ অক্টোবর ঢাকায় বাংলাদেশ-ভূটান-ভারত-নেপাল বিনিয়োগ ফোরামের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ভারতীয় হাই কমিশনার
৬. ২৮ অক্টোবর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী নাট্যোৎসবের উদ্বোধন অনুষ্ঠানের সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূরের সঙ্গে হাই কমিশনার
৭. ১০ অক্টোবর শিল্পী প্রশান্ত কর্মকার বুদ্ধর নতুন চিত্রকলা প্রদর্শনীর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে হাই কমিশনার

সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

বর্ষ তেতালিশ | সংখ্যা ১১ | কার্তিকঅগ্রহায়ণ ১৪২২ | নভেম্বর ২০১৫

www.hcidhaka.gov.in
Facebook page: /IndiaInBangladesh; @ihcdhaka
IGCC Facebook page: /IndiraGandhiCulturalCentre
Bharat Bichitra
Facebook page: /BharatBichitra

দেখা হল চক্ষু মেলিয়া

যজ্ঞগান

সূচিপত্র

দেখা হল চক্ষু মেলিয়া ০৪
প্রেমেন্দ্র মিত্র ছোটগল্পের রাজা ০৭
যজ্ঞগান ১০
ছোটগল্প: ফেরা ১২
বৌদ্ধ ধর্ম ও বিজ্ঞান ১৯
মহাকাশে ভারতের অ্যাস্ট্রোস্যাট ২২
কবিতা ২৪
ধারাবাহিক: রূপকথা ভূতকথা ভালবাসা ২৭
ছোটগল্প: প্রতীক্ষা ৩৩
রাজা বিক্রমাদিত্য ও বত্রিশ পুতুলের গল্প ৪০
অনুবাদ গল্প: কালাপাহাড় ৪৩
শেষ পাতা: ভারতে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ৪৮

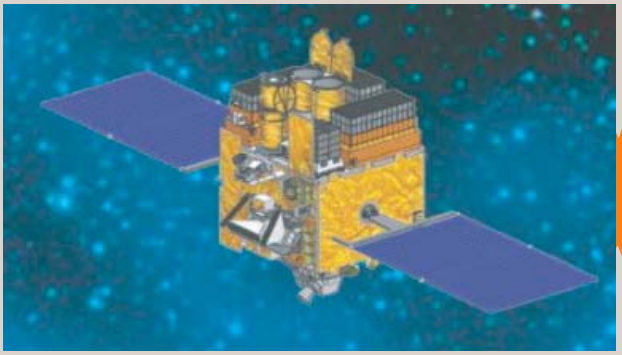

মহাকাশে ভারতের অ্যাস্ট্রোস্যাট

আস্ট্রোস্যাট। ভারতের কৃত্রিম উপগ্রহ। অ্যাস্ট্রো ও স্যাটেলাইট (উপগ্রহ) শব্দ দুটি জুড়ে নামকরণ। সময় ২০১৫ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর সোমবার সকাল ১০টা। স্থান অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটার সতীশ ধবন মহাকাশ কেন্দ্র। পাঁচ, চার, তিন, দুই, এক...। গুণতির রেশ মিলিয়ে যাওয়ার আগেই আগুনের শিখা ছড়িয়ে রকেট উড়ল আকাশ ফুঁড়ে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে পুলিকট হ্রদ লাগায়ো শ্রীহরিকোটার সতীশ ধবন মহাকাশ কেন্দ্র জুড়ে বোঝা গেল তার প্রতিক্রিয়া– গুমগুমগুম শব্দে। উৎক্ষেপণস্থলের সাত কিলোমিটারে দূরে মিডিয়া সেন্টারও রেহাই পেল না। মাটিতে ধাক্কা দিয়ে রকেটের ঊর্ধ্বগমনের পাল্টা অভিঘাতে থরথর করে কেঁপে উঠল চারতলা বাড়িটা।

শিল্প নির্দেশক ধ্রুব এষ
গ্রাফিক্স নূরন নাহার

মুদ্রণ গ্রাফোসম্যান রিপ্রোডাকশন এন্ড প্রিন্টিং লি.
৫৫/১ পুরানা পল্টন ঢাকা১০০০ ফোন ৯৫৫৪৮০৪

সম্পাদক নান্টু রায়
ফোন ৯৮৫০১৯৩৭, ৯৮৮৮৭৮৯৯১ এ ক্স: ১৪৯
ফ্যাক্স ৮৮০২৯৮৮২৫৫ ৫, e-mail: informa@hcidhaka.gov.in

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ভারতীয় হাই কমিশন
বাড়ি নং ২ সড়ক নং ১৪২ গুলশান১ ঢাকা১২১২

ভারতীয় জনগণের শুভেচ্ছাসহ বিনামূল্যে বিতরিত ভারত বিচিত্রায় প্রকাশিত সব রচনার মতামত লেখকের নিজস্ব– এর সঙ্গে ভারত সরকারের কোন যোগ নেই
এই পত্রিকার কোনও অংশের পুনর্মুদ্রণের ক্ষেত্রে ঋণস্বীকার বাঞ্ছনীয়

পাঠকের পাতা

ভাবলে রোমাঞ্চ হয়

প্রথমেই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও নমস্কার জানাই। মাঝে মাঝে দেখি, পড়ি *ভারত বিচিত্রা*– খুবই ভাল লাগে। প্রকাশিত লেখার বিষয়, মান, ছাপা, বিন্যাস, সবই অতি চমৎকার। আমাদের দেশের কাগজ, অথচ প্রকাশিত হচ্ছে বাংলাদেশে, ভাবলে বেশ রোমাঞ্চ হয়। এমন মানের পত্রিকার ধারাবাহিক প্রকাশ খুবই আনন্দের। আমার একজন লেখকবন্ধু অনেকদিন থেকেই আমাকে বলেছে *ভারত বিচিত্রায়* লেখা পাঠাতে। পত্রিকা দেখে আমারও সে ইচ্ছা জাগে। আমি কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধ লিখে থাকি। কয়েকটি বই প্রকাশিত হয়েছে। আপাতত আমি ৩টি কবিতা পাঠালাম। এগুলি আমার মৌলিক রচনা। অপ্রকাশিত। আপনাদের ভাল লাগলে, ছাপা হলে পরবর্তীকালে অন্যান্য লেখা পাঠানো যাবে। অবশ্যই আপনাদের সম্মতি পেলে। অভিনন্দনসহ, প্রতীক্ষায় রইলাম–

রণজয় মালাকার
কাঁচরাপাড়া, ভারত

নিয়মিত পড়া আবশ্যক

আমি ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত মাসিক *ভারত বিচিত্রা* পড়তে ইচ্ছুক। পত্রিকাটি গবেষণামূলক হওয়ায় তা পড়ে আমি ভারতের বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক তথ্য-উপাত্ত সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারি। তা ছাড়া, সামাজিকসাং স্কৃতিক অনেক বিষয়ের সঙ্গে বাংলাদেশের মিল থাকায় ভারতকে ভালভাবে জানার *জন্য ভারত বিচিত্রা* নিয়মিত পড়া আবশ্যক। তাই সব সময় এর সঙ্গে সংযুক্ত থাকতে চাই।

আমাকে *ভারত বিচিত্রার* সঙ্গে সব সময় সংযুক্ত রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হল।

কাজী নেয়ামুল শাহীন অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)
সরকারি খুলনা মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
খালিশপুর, খুলনা৯০০০

তুলনা নেই

আমরা *ভারত বিচিত্রার* ভক্ত পাঠক। ভারতবর্ষকে জানতে এবং এর সনাতন ধর্ম, শিক্ষাসং স্কৃতি, শিল্পসাহিত্য, জ্ঞানবিজ্ঞান প্রভৃতি সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞানলাভে পত্রিকাটির তুলনা নেই। ময়মনসিংহ জেলার ধোবাউড়া উপজেলার পোড়াকান্দুলীয়া গ্রামে শত বছরের প্রাচীন শ্রীশ্রী শ্মশানকালী মন্দির প্রতিষ্ঠিত। আমরা এই মন্দিরের সেবক। আমরা মাঝেমধ্যে *ভারত বিচিত্রা* সংগ্রহ করে পড়ি। কিন্তু নিয়মিত গ্রাহক না হওয়ায় প্রকাশিত সকল সংখ্যা পড়তে পারি না বলে সবসময়ই দুঃখ বোধ করি। সম্প্রতি *ভারত বিচিত্রার* আগস্ট '১৫ সংখ্যায় দেখলাম নতুন গ্রাহক অন্তর্ভুক্তির বিজ্ঞাপন। নতুন গ্রাহক হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার প্রত্যাশায় এ চিঠি। ভারতের তীর্থস্থানগুলির মাহাত্ম্য ধারাবাহিকভা বে *ভারত বিচিত্রায়* প্রকাশ করলে বাধিত হব।

উপেন্দ্র সাহা সভাপতি
শ্রীশ্রী শ্মশানকালী মন্দির, পোড়াকান্দুলীকা বাজার
ডাকঘর– পোড়াকান্দলীয়া, ময়মনসিংহ ২৪১০

অভিভূত

সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ *ভারত বিচিত্রা* বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সেতুবন্ধ তৈরি করেছে। আমাদের বন্ধুপ্রতিম দেশ ভারত সম্পর্কে জানতে হলে জনপ্রিয় এই পত্রিকাটি পড়তে হবে।

আমি *ভারত বিচিত্রা* পড়তে পেরেছি, এর সম্পর্কে জানতে পেরেছি আমার এক বন্ধুর কল্যাণে– এজন্যে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছি। আমার বন্ধু অনিক এই পত্রিকাটির সঙ্গে আমায় পরিচিত করায়। প্রকাশনাটি পড়ে আমি অত্যন্ত অভিভূত।

অসম্ভব সুন্দর প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ও সংবাদে ভরপুর *ভারত বিচিত্রা* পড়ে একদিকে যেমন আনন্দিত হলাম, পাশাপাশি নিজেকে দুর্ভাগা মনে করলাম– এতদিন এর সম্পর্কে জানতাম না বলে। আমার ঠিকানায় প্রতি মাসে প্রত্রিকাটি পাঠানো হলে আমি ভীষণ খুশি হব এবং ভারত প্রসঙ্গে আরো জানতে পারব।

বিগত সংখ্যাগুলো পাঠানো বা সংগ্রহের ব্যবস্থা থাকলে আমি আনন্দের সঙ্গে সেসব সংগ্রহ করতে চাই।

মোহাম্মদ মহসিন উদ্দিন
৪/২৪ সলিমুল্লাহ রোড, বস্নক ডি
মোহাম্মদপুর, ঢাকা ১২০৭

সনির্বন্ধ অনুরোধ

ফ্রেন্ডস্ অর্গানাইজেশন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত গুলিসাখালী সার্বজনীন কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারটি ইউনিয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত বিধায় গ্রন্থাগারটি দিন দিন ছাত্রশি ক্ষক-সুধীজন-গুণীজনসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের পদচারণায় মুখরিত। এর পাঠকবৃন্দ প্রতিদিন বিভিন্ন বই ও পত্রপ্রত্রিকা পাঠ করে জ্ঞান আহরণ করছে। এখানে ধর্মগ্রন্থসহ বিজ্ঞান, সাহিত্য, ও জ্ঞানমূলক বইয়ের সংখ্যা হাজারখানেকের কম নয়। কিন্তু সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ *ভারত বিচিত্রা* না থাকায় কোথায় যেন ঘাটতি থেকে যাচ্ছে। চিত্ত

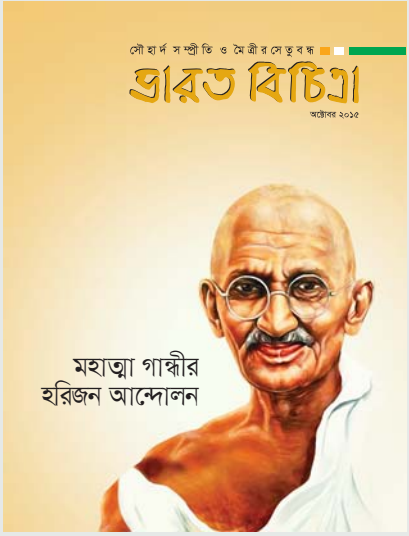

বিনোদনের মাধ্যম ও জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধির সহায়ক হিসেবে এটি আবশ্যক বলে আমরা মনে করি। তাই সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ ভারত বিচিত্রা নিয়মিত প্রেরণের জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ রাখছি।

মো. হাফিজুর রহমান সভাপতি
গুলিসাখালী সার্বজনীন কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার
গ্রাম + ডাক– গুলিসাখালী, উপজেলা– মঠবাড়িয়া
পিরোজপুর

আকর্ষণ দুর্নিবার

শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের স্মৃতিধন্য চাখার দরবার মঞ্জিল সিনিয়র মাদ্রাসার শিক্ষার্থী ও শিক্ষকবৃন্দ নিয়মিতঅনিয়মিতভা বে দীর্ঘদিন যাবৎ শিল্পসাহিত্যসং স্কৃতি-জ্ঞানবিজ্ঞানএর অনবদ্য সমাহার *ভারত বিচিত্রা* পাঠ করে জ্ঞানপিপাসা পরিতৃপ্ত করছে। অনিয়মিত বলার কারণ মাঝে মাঝে পত্রিকাটি আর আমাদের হাতে পৌঁছে না। তারপরও এ পত্রিকার সাহিত্য ও বিজ্ঞানবিষয়ক লেখাগুলোর আকর্ষণ ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকম-লীর কাছে দুর্নিবার। ভ্রমণকাহিনিগুলো আমাদের নিয়ে যায় অচেনা না জানার এক নতুন জগতে। এ কারণে *ভারত বিচিত্রার* সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্যে আমাদের এই অদম্য ব্যাকুলতা।

সম্পাদক ও প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এজন্যে যে তাঁরা দলবদ্ধভাবে পত্রিকাটিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। *ভারত বিচিত্রার* প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ ও একে প্রাঞ্জল রূপ দেওয়ার যে লক্ষ্য তা সাফল্যমণ্ডিত হোক। এ প্রিয় পত্রিকার পুরনো গ্রাহক হিসেবে নতুন করে আমাদের গ্রাহক তালিকাভুক্ত করলে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকমণ্ডলী উপকৃত হবেন।

প্রশান্ত কুমার বাইন প্রভাষক
চাখার দরবার মঞ্জিল সিনিয়র মাদ্রাসা
ডাক– চাখার, বানারীপাড়া, বরিশাল

সম্পাদকীয়

কলকাতা হাইকোর্টের ব্যারিস্টার কিন্তু পসার নেই। দেউলে বাপের ছেলে বলে বাজারে ভারি দুর্নাম– মক্কেল মেলে না। তবু অসীম ধৈর্যে আইনের বই পড়ে চলেন। ক্রমে ক্রমে দু'একটি স্বদেশী মামলা পেতে আরম্ভ করলেন। আলীপুর আদালতে মস্ত ভিড়– মানিকতলা বোমা হামলার মামলা চলছে। সরকারপক্ষে সেরা উকিল-ব্যারিস্টার। আসামী অরবিন্দ ঘোষের আর মুক্তি নেই। আসামীপক্ষে সওয়াল করতে উঠলেন ঐ পসারহীন ব্যারিস্টার। যেন আগুনের তুবড়ি ছুটল– কি বক্তৃতা, কি জ্ঞান! অরবিন্দ মুক্তি পেলেন। এরপর থেকে তিনি হয়ে উঠলেন দেশসেরা ব্যারিস্টার। দিনে আয় দাঁড়ালো দু'হাজার টাকা।

বাপ ছিলেন ধনী এটর্নি, তাই ছেলেবেলা তাঁর ভোগ-বিলাসেই কেটেছিল। মাঝে কয়েকটি বছর, বাপ দেউলে হয়ে মারা যাওয়ায়, চরম দারিদ্র্যের মধ্যে তাঁকে কাটাতে হয়েছে। এবার ভোগ-বিলাসে গা ভাসালেন। দেশের সৌখিন ধনীদের আদর্শস্থল হয়ে উঠলেন। শোনা যায়, প্যারিস থেকে তাঁর পোশাক ধোলাই হয়ে আসত। লোকে দেউলে হলে তাকে আর ঋণ শোধ করতে হয় না। কিন্তু ব্যারিস্টারটি বাপের প্রতিটি ঋণ তিনি পাই পাই করে মিটিয়ে দিলেন। এক-দু'টি টাকা নয়, তখনকার দিনের পঁচাত্তর হাজার টাকা– আজকের হিসেবে কয়েক কোটি টাকা তো হবেই।

কংগ্রেস নির্দেশ দিল, ভারতের স্বাধীনতার জন্য দেশবাসীকে বিলেতি জিনিস আর ভোগ-বিলাস বর্জন করতে হবে। তিনি এক নিমেষে সব ছেড়ে ফকির সাজলেন। ছেড়ে দিলেন দৈনিক দু'হাজার টাকা আয়ের ব্যারিস্টারি। ইংরেজ সরকারের সকল কাজে বাধা দেওয়ার জন্য যোগ দিলেন অসহযোগ আন্দোলনে। নিজের যথাসর্বস্ব দেশবাসীকে উৎসর্গ করলেন।

হ্যাঁ, ঐ ব্যারিস্টারই হলেন চিত্তরঞ্জন দাশ। দেশের জন্য, দেশবাসীর জন্য সবকিছু অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছিলেন বলে সবাই তাঁকে 'দেশবন্ধু' আখ্যায় ভূষিত করে। কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র পদ সৃষ্টির পর থেকে তিনিই আমৃত্যু ঐ পদে আসীন ছিলেন; একবার কংগ্রেসের সভাপতিও হয়েছিলেন। ছিলেন অসাধারণ বাগ্মী, উঁচুদরের কবি। ইংরেজ সরকারের বিরোধিতা করায় তাঁকে জেলে যেতে হয়। মুক্তি পেয়ে দেশের জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে থাকেন। ফলে স্বাস্থ্যহানি ঘটে। স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের আশায় দার্জিলিঙ যান। সেখানেই মাত্র পঞ্চান্ন বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তারিখ ৫ নভেম্বর ১৯২৫। কলকাতায় তাঁর মরদেহ নিয়ে যে শোভাযাত্রা বেরিয়েছিল, তেমন শোভাযাত্রা ইতোপূর্বে আর হয়নি।

গত কয়েকবছর ধরে বাংলাদেশের একশো তরুণের একটি চৌকস প্রতিনিধিদল প্রতিবছর ভারতের রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আসছেন। এবছরও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। ভারতের প্রথম বাঙালি রাষ্ট্রপতির সঙ্গে এই সাক্ষাৎকারে দুই দেশের মৈত্রীর বন্ধন যেমন সুদৃঢ় হয়, তেমনি ভারতের রাষ্ট্রপতিও বাংলাদেশের হালফিলের খবর জানতে পারেন। বাংলাদেশের প্রতি তাঁর রয়েছে অকৃত্রিম ভালবাসা, কারণ মুজিবনগর সরকারকে স্বীকৃতিদানের জন্য তিনিই প্রথম ভারতীয় পার্লামেন্টে প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। দুই দেশের সৌহার্দ, সম্প্রীতি ও মৈত্রীর বন্ধন সুদৃঢ় হোক, ভারতীয় রাষ্ট্রপতির সঙ্গে আমাদেরও একই প্রার্থনা।

অভিজ্ঞতা

দেখা হল চক্ষু মেলিয়া

রাষ্ট্রপতির সঙ্গে শত তরুণের সাক্ষাৎ

এস এম ফয়েজ

গত কয়েক বছরের মত এবারও ভারত সরকারের আমন্ত্রণে দেশটি সফরের সুযোগ পায় বাংলাদেশের একশো তরুণ্লতর ণী। আমিও স্লেদ লে অন্তর্ভুক্ত হতে পেরে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি। এই সুযোগে প্রাণভরে দেখার সুযোগ হয় ভারতের ঐতিহাসিক স্থান ও স্থাপনাগুলো। ঢাকা থেকে আমাদের দিল্লিযাত্রা ৪ অক্টোবর, ২০১৫। একই বিমানে ছিলেন বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহাও। আর শত তারুণ্যের মধ্যে বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, তরুণ সাংবাদিকসহ বিভিন্ন শ্রেণি পেশার আরও কয়েকজন। অনুপাতে আমরা সমান সমান। ৫০ নারী, ৫০ পুরুষ। ২০১২ সাল থেকে ভারত সরকার এ ভ্রমণের ব্যবস্থা করে আসছে।

দিল্লি পৌঁছেই ইন্ডিয়া গেট আমাদের বিস্ময়ে আপ্লুত করে। দর্শনীয় দুয়ার দর্শন দিয়েই শুরু ভারতদর্শন। পরদিন গন্তব্য ভারতের রাষ্ট্রপতি ভবন। রাষ্ট্রপতি ভবনটি তৈরির পরিকল্পনা হয়েছিল ১৯১১ সালে কলকাতা থেকে দিল্লিতে রাজধানী স্থানান্তরের সিদ্ধান্তের পর। ব্রিটিশ শাসনামলে এটি ছিল ভাইসরয় হাউজ। ১৯৫০ সালে রাজেন্দ্রপ্রসাদ ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি মনোনীত হলে এর নাম হয় রাষ্ট্রপতি ভবন।

দেশটির প্রথম বাঙালি রাষ্ট্রপতিকে কাছ থেকে দেখা অনেকটা স্বপ্নের মত। ফটোসেশনের পর তাঁর আতিথেয়তা। আর রাষ্ট্রপতির গার্ডের নান্দনিক কুচকাওয়াজ উপভোগ তো রাজসম্মান! তাই ৬ অক্টোবর মঙ্গলবার দিনটি বাংলাদেশের তারুণ্যদীপ্ত শতপ্রাণে একটি স্মরণীয় দিন। শুরুতেই বাংলা ভাষার চমক। আমাদের চমকে দিয়ে ভারতের রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জি বলে ওঠেন, 'আমি কিন্তু নড়াইলের জামাই।'

শ্বশুরালয়ের স্নেহাস্পদদের আপন করে নিলেন জামাইবাবু। তারপর মিষ্টি হেসে বললেন, 'দিনকে দিন গভীরতর হচ্ছে বাংলাদেশ ও ভারতের বন্ধুত্ব। আরো এগিয়ে যাবে সম্প্রীতির এ বন্ধন।' বাংলাদেশকে উন্নয়নের সোপানে তুলতে তরুণপ্ন্ জন্মের স্বপ্নকে বাস্তবায়নের পরামর্শ দিয়ে বললেন, 'এ জন্য উদ্যোগ নিতে হবে সরকারকে। তরুণরাই কাণ্ডারী, তারাই ভবিষৎ, তাঁরাই একদিন দেশের হাল ধরবে।' তাঁর কথাগুলো আমাদের সামনে চলার পথে তাৎক্ষণিক অনুপ্রেরণা দেয়। সাক্ষাতে তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পাশে থাকার স্মৃতিচারণও করেন। শিল্পসং স্কৃতির কোন সীমানা নেই, স্লেকথাও আমা দের মনে করিয়ে দেন ভারতের প্রথম বাঙালি রাষ্ট্রপতি। প্রণব মুখার্জি আমাদের সম্বোধন করলেন বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রজন্ম নামে। আমাদের নিমন্ত্রণ করায় তাঁর দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়কে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন যে, তিনি চতুর্থবারের মত তরুণ বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পেলেন। রাষ্ট্রপতি ভবনের দিকে ইঙ্গিত করে তিনি আমাদের বলেন, 'শুধু এই ভবন নয়, ভারতের ১৩তম রাষ্ট্রপতিরও দাবিদার আপনারা। লক্ষণীয় বিষয় ছিল তিনি একবারও আমাদের 'তুমি' বলে সম্বোধন করেননি। বরাবরই বলেছেন 'আপনি'।

রাষ্ট্রপতি হওয়ার আগে বাংলাদেশে তাঁর শ্বশুরালয়ে যাওয়ার সুযোগ হয়নি এ কথা জানিয়ে বলেন, 'পরে ২০১৩ সালে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে গিয়েছিলাম। শ্রী মুখার্জি বলেন, 'সৌভাগ্য হয়েছিল আপনাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণের। বন্দুক হাতে নয়, সহায়তার মাধ্যমে।' প্রণব মুখার্জি বলতে থাকেন– 'এই উপমহাদেশ থেকে আমি প্রথম ১৯৭১ সালের ১৫ই জুন ভারতের পার্লামেন্টে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করি মুজিবনগর সরকারকে স্বীকৃতিদানের জন্য। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবর্তমানে এ সরকারের নেতৃত্বে ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম। প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তাজউদ্দিন আহমেদ। যখন ৩রা ডিসেম্বর জেনারেল ওসমানীর নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনি ও ভারতের সৈন্যরা যৌথভাবে পাকবাহিনিকে প্রতিহত করে তখন প্রকৃত স্বীকৃতি আসতে শুরু করে। আমার বক্তব্যে মানুষের দুঃখ্লক ষ্ট, ভোগান্তির বিবরণ পার্লামেন্টের নজরে আসে। আপনাদের অর্জিত স্বাধীনতা রক্ত ও ঘাম দিয়ে সংরক্ষণ করতে হবে। সংরক্ষণ করতে হবে মানবাধিকারও।' বাংলাদেশে এখন ১৬ কোটি মানুষ উল্লেখ করে শ্রীমুখার্জি বলেন, 'স্বাধীনতার সময় এ সংখ্যা ছিল সাড়ে সাত কোটি। জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে। সমস্যা বেড়েছে বিস্ময়করভাবে।' প্রণব মুখার্জি বাংলাদেশ সরকারকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, 'স্বাস্থ্য, শিক্ষা, অর্থনৈতিকভাবে যুক্তিসঙ্গত প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে।' তিনি বাংলাদেশের জন্য ভারতের সহায়তার হাত প্রসারিত রাখার আশ্বাস দিয়ে বলেন, 'আমাদের বন্ধন রক্ত ও ত্যাগের বাঁধনে বাঁধা। হুমায়ূন আহমেদের একটি উপন্যাসের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন, 'শুধু মুক্তিবাহিনি নয়। অসংখ্য ভারতীয় সৈন্যও বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য জীবন দিয়েছে। আপ্যায়ন শেষে রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে বিদায়ের সময় বারবার মনে হচ্ছিল যেন আপনজনের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি।

বাসের বদলে আনন্দ বিহারে যাওয়ার ব্যবস্থা হয় মেট্রোরেলে।

দিল্লিজুড়ে মোট ১৩৭টি মেট্রো রেলস্টেশন। ১৮৯ কিলোমিটারে সাতটি অপারেশনাল লাইন। প্রতি ৩ থেকে ৪ মিনিট পরপর মেট্রো। এক মিনিটের মধ্যে যাত্রী ওঠানামা করে। এরপর আবার স্টেশন ছেড়ে যায়। মেট্রোতে ভ্রমণের মাধ্যমে বাংলাদেশের তরুণদের ধারণা হয় কিভাবে এগিয়ে যাচ্ছে আধুনিক দিল্লি। দিল্লিতে রাজধানী স্থাপনের পর সম্রাট শাহজাহান রেডফোর্ট বা লালকেল্লা নির্মাণ করেছিলেন। এটি নির্মিত হয় আগ্রার লালকেল্লার আঙ্গিকেই। মুঘল শাসকদের বিলাসিতা আর আভিজাত্যের নিদর্শন মেলে এই কেল্লা থেকে। রেডফোর্টের পরবর্তী গন্তব্য ইন্ডিয়া গেট। এরপর যাত্রা শুরু কুতুব মিনারের উদ্দেশে। দিল্লি থেকে ১৪ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত কুতুব মিনার বিশ্বের সর্বোচ্চ ইট নির্মিত মিনার। আশপাশে অনেক প্রাচীন, মধ্যযুগীয় স্থাপনা ও ধ্বংসাবশেষ। সব মিলিয়ে বলা হয় কুতুব কমপ্লেক্স। কুতুব মিনার থেকে হোটেলে ফেরে তরুণ প্রতিনিধিদলের গাড়িবহর। ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সৌজন্যে রাতে হোটেলে যুব ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নৈশভোজ। বাংলাদেশের প্রতিভাবান প্রতিনিধিদের একের পর এক পরিবেশনার পাশাপাশি ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে আসা তরুণ শিল্পীদের ঐতিহ্যবাহী নাচ ও গান পরিবেশনা সবাই উপভোগ করেন। ফিরতি বাসেও চলে নাচগান। গানের তালে গাড়িবহর আগ্রা পৌঁছে। তারপর তাজমহল যাওয়ার পালা। বাস থামে তাজমহলের গেট থেকে কিলোমিটারখানেক দূরে। সেখান থেকে ব্যাটারিচালিত মিনিবাসে তাজমহলের গেটের সামনে নামে ১০০জন তরুণ্নতর ঙণী। এরপর লাইন ধরে তাজমহলে প্রবেশ। সঙ্গে তিনজন গাইড। গাইডদের মুখে শোনা যায় তাজমহল নির্মাণের ইতিহাস। তাজমহলের চত্বরটি বেলেপাথরের দুর্গের মত দেয়াল দিয়ে তিনদিকে ঘেরা। নদীর দিকের পাশটিতে কোন দেয়াল নেই। এই দেয়ালবেষ্টনীর বাইরে আরও সমাধি রয়েছে। এর মধ্যে শাহজাহানের অন্য স্ত্রীদের সমাধি। রয়েছে মমতাজের প্রিয় পরিচারিকাদের একটি বড় সমাধিও। এ সব স্থাপত্য প্রধানত লাল বেলেপাথরে তৈরি। ১৬৩১ অব্দে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতাপশালী সম্রাট শাহজাহান তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী মমতাজের মৃত্যুতে প্রচ-ভাবে শোকাহত হয়ে পড়েন। স্ত্রীর প্রতি ভালবাসার নিদর্শন হিসেবে শাহজাহান দ্রুত তাজমহলের নির্মাণকাজ শুরু করেন। মূল সমাধিটি সম্পূর্ণ হয় ১৬৪৮ অব্দে এবং এর চারদিকের ইমারত এবং বাগান আরও ৫ বছর পরে নির্মিত হয়। তাজমহলের সামনে দাঁড়িয়ে মনে হল, কত পুরনো তবুও কত আধুনিক! নীরবে দাঁড়িয়ে অনুভব করার চেষ্টা, চিরকালের বিস্ময়কর এ স্থাপনা কল্পনা চেয়েও কত সুন্দর! তাজমহল দেখার মুগ্ধতা নিয়ে আমরা গেলাম দ্রোণাচার্য প্রকৌশল কলেজ দেখতে। সেটাও দারুণ এক অভিজ্ঞতা। ৮ অক্টোবর রাজস্থানে আমরা সাক্ষাৎ করি ভারতের যুব ও ক্রীড়ামন্ত্রী গজেন্দ্র সিং খিমসার সঙ্গে। তাঁর উষ্ণ অভ্যর্থনা আমাদের মুগ্ধ করে। এরপর উত্তর প্রদেশের ফতেপুর সিক্রির বুলন্দ দরজা দর্শন। সেখান থেকে আগ্রার লাল দুর্গ। বিস্ময় আর মুগ্ধতার ঘোর যেন কাটতে চায়নি শত তরুণ্নতর ঙণীর। আমরা তখনো জানি না আমাদের সামনে অপেক্ষা করছে আরো সৌন্দর্যের রাজস্থানের শ্রীবলরাম আদর্শ বিদ্যামন্দির। ৯ অক্টোবর আমরা দেখতে গেলাম সেই অপূর্ব স্থাপনাশৈলী। তারপর বাঙালির শহর কলকাতায়। সেখান থেকে রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে। দেখি প্রিয় কবির বিভিন্ন স্মৃতি। তারপর কলকাতায় নিউ মার্কেট। সেখানে স্বাচ্ছন্দ্যে কেনাকাটা। তারপর হোটেলে খাওয়া। এরপর বাসে করে এয়ারপোর্টের দিকে যাত্রা। পথে নজর কাড়ে গঙ্গার ওপরে হাওড়া ব্রিজ ও সল্টলেকের মনোরম দৃশ্য। সন্ধ্যায় এয়ার ইন্ডিয়ার ফ্লাইটে ঢাকার উদ্দেশে কলকাতা ছাড়ে বাংলাদেশের শত তারুণ্য।

লেখা **এস এম ফয়েজ**
ছবি **রিদোয়ান আদিদ রম্নপন**
ভারত সরকারের আমন্ত্রণে সফরকারী প্রতিনিধিদলের সদস্য

প্রবন্ধ

প্রেমেন্দ্র মিত্র | ছোটগল্পের রাজা

আশরাফ উদ্‌দীন আহ্‌মদ

বাংলাসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ এবং শক্তিশালী একটা শাখা অবশ্যই ছোটগল্প, এই ছোটগল্পকে প্রকৃত অর্থে আলোর মশাল দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১১৯৪১), গল্পসাহিত্যের যে ধারা বা রূপ, তাকে আজকের জায়গায় আনার পেছনের তাঁর অবদান চিরস্মরণীয়, আমরা এখন যাকে ছোটগল্প বলে চিহ্নিত করি তার জন্ম এবং পূর্ণতা রবীন্দ্রনাথের হাতেই, নিম্নবিত্ত বা নিম্নমধ্যবিত্ত অথবা মধ্যবিত্ত মানুষের জীবন নিয়ে তিনি গল্প লিখেছেন এবং সেইসঙ্গে ছোটগল্পকে নিয়ে এলেন মাটিমানুষ এবং প্রকৃতির কাছাকাছি, মধ্যবিত্ত মানুষের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার উন্মোচন, যা বাংলাসাহিত্যের পাঠকের কাছে নিবিড় পর্যবেক্ষণ এবং মন ও মননের দ্বার উন্মুক্ত করে দিল। রবীন্দ্রপরবর্তী যুগের সবচেয়ে সফল এবং শক্তিমান গল্পকার প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪ '৮৮)। তাঁর গাল্পিক হয়ে ওঠার পেছনে তাঁর পরিপার্শ্ব কী ভূমিকা রেখেছে সে আলোকে তাঁর গল্প। রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ ও নানা জীবনাভিজ্ঞতায় পুষ্ট প্রেমেন্দ্র ১৯৩৩ সালের মধ্যে কবিতা ও ছোটগল্প জগতে প্রতিষ্ঠিত ও জনপ্রিয় সাহিত্যিক রূপে নিজেকে স্বতন্ত্রভাবে চিনিয়েছিলেন, ত্রিশের শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে তাঁর অবস্থান যেমন তিনি করে নিতে পেরেছেন, ঠিক তেমনি আধুনিক বাংলা ছোটগল্পের আসনটিও ধরে রাখতে পেরেছিলেন বলেই একসময় তাঁকে বলা হত, 'ছোটগল্পের রাজা'।

হুগলী জেলার কোন্নগর গ্রামের বিখ্যাত মিত্রপরিবারের যোগ্য উত্তরাধিকারী প্রেমেন্দ্র মিত্র, যদিও তাঁর জন্ম বারাণসীতে, *কল্লোল* পত্রিকায় তাঁর প্রথম গল্প প্রকাশিত হয় ১৩৩১এর শ্রাবণ সংখ্যায়, গল্পটির নাম 'সংক্রান্তি',তারপর কল্লোলের সাত বছর জীবনের মাঝখানে কিছু সময় বাদে পুরো সময়টাই তিনি কল্লোলের সঙ্গেই ছিলেন, মাঝের সময়টা তাঁরা কল্লোলেরই কয়েকজন বন্ধু মিলে *কালিকলম* (১৩৩৩/১৯২৬) নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু পত্রিকাটি বেশিদিন স্থায়ী হয়নি।

‘তেলেনাপোতা আবিষ্কার’ গল্পে গ্রাম এবং নগরের মেলবন্ধন দেখা যায়, গল্প বলার স্ট্যাইল অন্যরকম, নগর থেকে গ্রাম দেখার যে আকাঙ্ক্ষা তারই একটা চিত্র, ওখানে গ্রামবাসিনী এক তরুণী যামিনী প্রতারিত হয়েছে নগরবাসী মানুষের মৌখিক সহানুভূতি পেয়ে। নগরজীবনের মেকি কৃত্রিমতার দ্বারা এখানে কিছু আক্রান্ত দেখতে পেয়েছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, এ গল্পে কল্পিত নায়কের কথা ভেবে যে আবার যামিনীকে ফিরে আসার আশ্বাসের বাণী শোনাবে, কিন্তু মহানগরের জীবনে চলে এসে বিস্মৃত হয়ে যাবে সেই পুরানো আশ্বাসের বাণী।

কল্লেলযুগের তিন মহানায়ক বুদ্ধদেব বসুঅচি ন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত এবং প্রেমেন্দ্র মিত্র, বাংলা সাহিত্যে কল্লোল যে বিশাল প্রতিভাবানদের মিছিল সৃষ্টি করেছিল, সেই মিছিলের অগ্রগামী যোদ্ধা ছিলেন প্রেমেন্দ্র, তাঁর অধিকাংশ গল্পেই মধ্যবিত্তের টানাপোড়েন ও যন্ত্রণার চিত্র অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে চিত্রায়িত হয়েছে, তাঁর কবিতার মতই ছোটগল্পের ভাষায় চিত্রকল্পের অবয়ব স্বাভাবিক হয়ে ওঠে, অনুভূতিকে য়ে কোন ভাষাচিত্রে ফুটিয়ে তুলতে চিত্রকল্প, প্রেমেন্দ্রর গল্প শৈলীর বিশিষ্ট পদ্ধতি, সমগ্র গল্পটিকে একটি প্রতীকের ফ্রেমে আবদ্ধ করা, সেখানে গল্পের কোন নির্দিষ্ট অংশের ভাষাচিত্রের প্রতি মনোনিবেশ বা অভিনিবেশ রাখার আবশ্যকতা নেই, সেখানে গল্পটিকে কেন্দ্রীয় দ্বন্দ্ব বা সংকট কোন একটা বস্তু বা প্রাণী বা পরিবেশ প্রতীকের মধ্যে সংহত হয়ে দেখা যায়, ১৯০৪ থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ জীবনে তিনি কবিত্ম ছোটগল্প উপন্যাস্লপ্ন বন্ধুকি শোর সাহিত্য রচনা করে বাংলাসাহিত্যেকে সমৃদ্ধ করেছেন। যদিও তিনি ১৯৩৭ থেকে ১৯৫৪ সাল অবধি চলচ্চিত্রের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রেখেছিলেন। তারপরও তার সাহিত্যভাণ্ডার নেহাঙ্গই কম নয়, ২০টি কাব্যগ্রন্থ ও ছড়াগ্রন্থ, ২৮টি গল্পগ্রন্থ, ৫৪টি উপন্যাস, ৬২টি কিশোর কথাসাহিত্য, ১৭টি গোয়েন্দা উপন্যাস, ০৭টি প্রবন্ধগ্রন্থ, ০৭টি নাটক এবং ০৬টি অনুবাদগ্রন্থ প্রেমেন্দ্র মিত্রের মানস পরিচয় করিয়ে দেয়। প্রকৃতঅর্থেই তিনি সব্যসাচী লেখক। নানান রূপে তাঁকে আমরা দেখি, কখনো এই প্রেমেন্দ্র স্মৃতিকথার রচয়িত্মনাট্যকারূস স্পাদক্ক চলচ্চিত্র নির্মাত্মপরিচালক্ককাহিনিকারূচি ত্রনাট্য রচয়িতা এবং গীতিকার। বলা যায় জীবনভর তিনি অবিশ্রাম সৃজনশীল কাজে সৃষ্টিসুখের উল্লাসে কাটিয়েছেন, শুধুই নতুন সৃষ্টির প্রত্যাশায়, সমস্ত সৃষ্টি যে তাঁর হাতে ধরা দিয়েছে, ১৯৮৮ সালে দুরারোগ্য কান্সারে আক্রান্ত হয়ে এই জীবনবাদী সাহিত্যে নিবেদিতপ্রাণ শিল্পী চিরনিদ্রায় শায়িত হন। তাঁর গল্পসাহিত্য যে কত সমৃদ্ধ এবং এ শাখায় তাঁর পদচারণা যে কত সাবলীল তারই একটা রূপ দেখব, বিস্ময়ের কথা হল, তিনি দেড়শোর (২৮টি গল্পগ্রন্থ) বেশি গল্প লিখেছেন, এবং প্রতিটি গল্পে আমাদের চারপাশের জীবন্নসংসা রের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে, সেখান থেকে কয়েকটি গল্প নিয়ে আলোচনা করলে পাঠকের একটা ধারণা হবে প্রেমেন্দ্র মিত্র কতবড় মাপের সাহিত্যিক ছিলেন, যা তাঁকে আজও স্মরণযোগ্য করে রেখেছে।

‘তেলেনাপোতা আবিষ্কার’ গল্পে গ্রাম এবং নগরের মেলবন্ধন দেখা যায়, গল্প বলার স্ট্যাইল অন্যরকম, নগর থেকে গ্রাম দেখার যে আকাঙ্ক্ষা তারই একটা চিত্র, ওখানে গ্রামবাসিনী এক তরুণী যামিনী প্রতারিত হয়েছে নগরবাসী মানুষের মৌখিক সহানুভূতি পেয়ে। নগরজীবনের মেকি কৃত্রিমতার দ্বারা এখানে কিছু আক্রান্ত দেখতে পেয়েছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, এ গল্পে কল্পিত নায়কের কথা ভেবে যে আবার যামিনীকে ফিরে আসার আশ্বাসের বাণী শোনাবে, কিন্তু মহানগরের জীবনে চলে এসে বিস্মৃত হয়ে যাবে সেই পুরানো আশ্বাসের বাণী। অনেক্কঅ নেকদিন পরে আবার কোনদিন হয়তো তার মনে পড়বে, গম্ভীর কঠিন যার মুখ আর দৃষ্টি, যার সুদূর আর করুণ, ধ্বংসপুরীর ছায়ার মত সেই মেয়েটি হয়তো আপনার কোন দুর্বল মুহূর্তের অবাস্তব কুয়াশাময় কল্পনা, একবার ক্ষণিকের জন্য আবিষ্কৃত হয়ে তেলেনাপোতা আবার চিরন্তন রাত্রির অতলতায় নিমগ্ন হয়ে যাবে। মহানগরের ঔদাসীন্যে ধ্বংসোম্মুখ গ্রাম বিলীন হবার পথে ‘তেলেনাপোতা আবিষ্কার’ গল্পটি একমাত্র, যদিও একালে সে আশঙ্কা বাস্তবায়িত হয়নি, তবুও গাল্পিক যে উদাসীনতার কথা লিখেছেন তা একটি বিশেষ শ্রেণীর মন্ন মানসিকতার ওপর নির্ভর করে তাতে কোন সন্দেহ নেই। ছোটগল্পের শিল্পরূপ বিষয়ে সর্বপ্রথম বিশ্বখ্যাত সাহিত্যিক এডগার অ্যালান পো একটি গল্পগ্রন্থ সমালোচনায় ‘লেখার পরিসীমা এবং একক উপলব্ধির প্রসঙ্গ’ বিষয়ে লিখেছিলেন। আমাদের অবশ্যই স্মরণ রাখা প্রয়োজন, এডগার অ্যালন প্লোর অনুরাগী ছি লেন প্রেমেন্দ্র মিত্র।

‘স্টোভ’ গল্পেও মানুষের একটা জটিল চেহারা দেখতে পাওয়া যায়। জগত্নসংসা রে মানুষ চেনা হয়তো মোম কঠিন। শশীভূষণ ভালবাসতো মল্লিকাকে, কিন্তু এরকম পুরুষ সমাজে থাকে, যারা ভালবাসতে পারে অথচ ভালবাসার দাবি জোর করে প্রতিষ্ঠা করতে পারে না, মল্লিকা অনেকদিন বাদে হঠাঙ্গই একদিন বেড়াতে এসেছে শশীভূষণের বাড়ি, কেউই তা জানত না, শশীর স্ত্রী বাসন্তী, যে কিনা মল্লিকাকে ভেবে এতকাল শশীর গোপন রহস্য বের করতে পারেনি, কিন্তু আজ তাকে দেখে হিংসায়্লবি দ্বেষে জ্বল্লেপু ড়ে ওঠে, তাই বাসন্তী সেই পুরানো বাতিল হওয়া স্টোভটা জ্বালিয়ে চা বানাচ্ছে, শশীভূষণ রান্নাঘরে এসে স্ত্রীকে ভৎর্সনা করে মল্লিকার সামনে, বাসন্তী কিন্তু এমন কিছু বলতে চায় না, যা পরবর্তীসময়ে একটা কেলেঙ্কারি কাণ্ড হয়ে দাঁড়াবে, মল্লিকা স্টোভে পাম্প দিলে ভয় দেখায় শশী, যদি ফেটে গিয়ে কোন অনাকাঙ্ক্ষিত কাণ্ড ঘটে, এদিকে মল্লিকার ভয়, যদি স্টোভ ফেটে বাসন্তী বউদির মৃত্যু হয়, তখন কি হবে, একটা দোলাচল চলে মনে, হয়তো দুজনের মধ্যেই কিন্তু তারপরও স্টোভটা হিংস্র গর্জন করছে, যেন বাসন্তীর মনের ভেতরের ক্ষোভই গর্জন করছে, মনস্তাত্ত্বিক এই গল্পটি ভালবাসা এবং ব্যর্থতার এক প্রতীকি গল্প, গল্পের মূল সারমর্ম, নারী পুরুষ সম্পর্কনিহিত ঈর্ষা।

‘অনাবশ্যক’ গল্পে একজন গৃহকর্ত্রী স্বর্ণময়ীকে আমরা দেখি, যে একটা সংসারের সর্বময় কর্ত্রী, তার কাছে সংসার ছেল্লে ছেলেবউনাত্নি নাতনীই বড় কথা, বাড়ির সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয়াদি তিনি নিয়ন্ত্রণ করেন। তার কথার একটা দাম আছে, ছেলেরাও মাকে যেমন ভালবাসে, ছেল্লে বউরাও শ্বাশুড়িকে মা জ্ঞানে শ্রদ্ধাভ ক্তি করে, কিন্তু একটা সময় তার বার্ধক্য তাকে থামতে বলে, কিন্তু বার্ধক্যেকে তোয়াক্কা করেন না, যদি তোয়াক্কা করেন তাহলে তিনি অনাবশ্যক হয়ে যাবেন, এই ভয়ে তিনি যেন সদাসর্বদা তৎপর, গল্পটি মনস্তাত্ত্বিক, একটা ধাঁধার মধ্যে স্বর্ণময়ী দিনযাপন করেন, কিন্তু একসময় তার শরীর সত্যসত্যিই খারাপ হল, তখন তাকে বিশ্রাম নিতে ডাক্তার পরামর্শ দিল, তখন তিনি ছেলেদের বললেন, ‘এবার আমায় কাশী পাঠিয়ে দে বাবা...’ নিজের অনাবশ্যকের কথা তিনি নিজের বুঝতে পারলেন, কিন্তু সংসার বড় বিচিত্র জায়গা, এখানে মায়া আছে, মমত্মভালবাসা আ ছে, তাই তাকে কেউ ছেড়ে দেবে না, স্বর্ণময়ী সবার ভালবাস্ম সেব্মায ত্নে দিনাতিপাত করতে লাগলেন। গল্পটিতে ভালবাসার এক মোমশক্তির বিজয়ের রূপ ধরা পড়েছে, হয়তো সংসারের এটাই নিয়ম, মানুষ একটা নিয়মের মধ্যেই চালিত হয়, কেউ তার ইচ্ছে মত চলতে পারে না।

প্রেমেন্দ্র মিত্র কোনদিনই গ্রামীণ ছিলেন না, তার শৈশব কেটেছে উত্তরপ্রদেশের মির্জাপুরে, সপ্তম শ্রেণী অবধি কলকাতায়, তারপর কখনো ঢাকায়, কখনো কাশীতে, কিন্তু আবার ফিরে আসেন কলকাতায়, তার লেখক জীবন আগাগোড়াই নগরকেন্দ্রিক এবং নাগরিক হিসাবে মহানগরকে চিনেছেন, যার কারণে গল্পেউপন্যাসে নগর এবং নগরের আশেপাশের জীবনযাপনের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে।

'শুধু কেরাণী' গল্প দিয়েই প্রেমেন্দ্র মিত্রের আত্মপ্রকাশ, সময়টা ১৯২৪, যে গল্পে একজন সামান্য বেতনের কেরাণীর জীবনকাহিনি উঠে এসেছে, অভাবের সংসার, কষ্ট করে পায়ে হেঁটে পয়সা বাঁচিয়ে স্বামী তার কিশোরী বধুটির জন্য একগাছি গোড়ের মালা নিয়ে আসে, তারপর মেয়েটির খোঁপায় জড়িয়ে দিয়ে বলে, বল্ দেখি কেমন গন্ধ? এমনি একটা কাহিনি সত্যিই মনকে শান্তি দেয় ব্লৈকি, কি ন্তু তারপর অভাব নামের ওই দৈত্যটা বড় ভয়াবহ, তার আরো রূপ ভয়ংকর! মেয়েটির অসুখ করে এবং চিকিৎসার জন্য ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়, ডাক্তার জানায়, অসুখটার নাম সূতিকা। কিন্তু চিকিৎসার খরচ চালাতে পারে না কেরাণী স্বামী, চিকিৎসাহীন মেয়েটি একদিন মারা যায়, গল্পে তেমন কোন নাটকীয় প্লট নেই, একেবারে সাদামাটা একটা ছোট এবং মাঝারি কাহিনিকে অসহায় ও অনিবার্য পরিণতি দিয়ে একটা প্রেক্ষাপট নির্মিত হয়েছে, এই গল্পের মাধ্যমে প্রেমেন্দ্র মিত্রকে হতভাগা নিম্নবিত্ত মানুষের রূপকার মনে হয়েছে বলতে দ্বিধা নেই।

'লেভেল ক্রসিং' গল্পে নাগরিক জীবনের কিছু টুকরো চিত্র দেখতে পাওয়া যায়, একজন কর্তব্যবান রুইদাসের গল্প এখানে উঠে এসেছে, সংসারে তার রুগ্না স্ত্রী রাখালী এবং একটা ছাগলী, কিন্তু বরাবর জেদ্রি একরোখা মানুষ, নিজের দায়িত্ব সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন, যদিও সে রেল গেটের জমাদার, তবুও কাউকে পরোয়া করে না, সংসারে তার আপন বলতে কেউ নেই, সবাই তার শত্রু, কারণ ছোট হতে সে জানে না, আমরা দেখতে পায়, হাকিম সাহেবের গাড়ি আটকে যায় রেলগেটে, কিন্তু রুইদাস হাকিমের আদেশ পেয়েও খুলতে রাজি নয়, পরবর্তীসময়ে লক্ষ্য করা যায়, হাকিমের কথা অমান্য করার কারণে রুইদাসের সাজা হয়, তার নামে হুলিয়া বের হয় এবং খুন্নজখম্মদা ঙ্গার দায়ে তাকে জড়ানো হয়। গল্পে শুধুমাত্র কর্তব্যপরায়ণ মানুষ হিসেবেই নয়, একজন গরীব মানুষও যে সৎ এবং সাহসী হতে পারে, সেই কাহিনি 'লেভেল ক্রসিং' গল্পে প্রেমেন্দ্র তুলে এনেছেন রুইদাসের মধ্য দিয়ে।

'পুন্নাম' গল্পটি মানবমনের দ্বন্দ্বমুখর একটি অসামান্য সৃষ্টি, অর্থনৈতিক বাস্তবতায় 'শুধু কেরাণী' গল্পের সমমাত্রিক, অবশ্য এ গল্পে প্রেমেন্দ্রের নিজস্ব ধ্যান্নধারণ্মউপলব্ধির প্রকাশ ঘটেছে তীব্রভাবে, সেই সঙ্গে সমাজ বাস্তবতার নানান সমস্যার সঠিক কারণ নির্দেশ এবং তা সমাধানের ইঙ্গিত দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন, মূল গল্পটি এরকম, ললিত একজন পিতা এবং সাধারণ কর্মচারী অর্থাৎ জাহাজ ডগের সরকার, আয় নিতান্ত হাতেগোনা, কোনভাবে দিনগুজরান করা আর কি! পুত্রের মারাত্মক অসুখ কিন্তু সেই অসুখের চিকিৎসা করানোর টাকা জোটানো দুষ্কর তার কাছে, তাই এখন সে কি করবে জানে না! ডাক্তারের কঠিন নির্দেশ, চেঞ্জে না গেলে শিশুকে বাঁচানো যাবে না কোনভাবেই। কিন্তু সে কিভাবেন্নবা যা বে, কত দূরেন্নবা যা বে, কেমন টাকা খরচা হবে তাও তো তার জানা নেই, এদিকে পুত্রের অবস্থা আরো খারাপের দিকে যাচ্ছে, ডাক্তার বারংবার বলছে চেঞ্জে যেতেই হবে। অনেক গড়িমসির পর একটা উপায় বের করে, নবজাতককে পৃথিবীতে আনার দায়মোচন করতে হয় তাকে ভিন্নপথ অবলম্বন করে, হয়তো এ্ন ছাড়া তার সামনে আর কোন পথই খোলা নেই জেনে। সে পথে অবশ্য শান্তি নেন্ন স্বস্তি নেই, আছে শুধু কঠিন দহন, ললিত সেই দহনের কাঠ যেন, আর তার ভেতরে চলতে থাকে ক্ষরণ, এই বৈপরীত্য ললিতের মনের গোপন অপরাধবোধকে যেন খুঁচিয়ে বের করে আনে, যখন তার স্ত্রীকে সে বলে, জাহাজের গাঁটরি চুরি এবং বিক্রি করে তার ছেলেকে চেঞ্জে নিয়ে যাওয়ার খরচা জোগাড় করেছে, তখন স্ত্রী ভয় পেয়ে বলে, তাহলে কী হবে? ললিতের আত্মদহন আত্মপ্রবঞ্চনায় রূপ নেয় যখন দেখে চেঞ্জে আসা প্রতিবেশী টুনুর ওপর তার ছেলের অমার্জনীয় আধিপত্য। এ্ন গল্পে শেষ পর্যন্ত দেখা যায় খোকা সুস্থ হয়ে ওঠে এবং টুনু মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কঠিন বাস্তবতার নির্দেশ এবং সর্বপরি একটা বিদ্রোহী মনের যন্ত্রণা গল্পটিকে আরো শাণিত এবং সজীব করেছে।

'মহানগর' গল্পে প্রেমেন্দ্র নাগরিকতাবিমুখ ছিলেন না, গ্রাম ও নগর এবং নগর থেকে মহানগর, এই ধারা সুস্পষ্ট ধরা পড়ে তার রচনায়। নগর জীবনের রূপকার যথার্থভাবেই আবিষ্কার করেছেন নগরের অভিশাপে নারী কিভাবে পতিতা হয়, পতিতা সমস্যা তো প্রাগৈতিহাসিকযুগ থেকে সমাজদেহের মানবজগতে চলে আসছে, প্রেমেন্দ্রের গল্পে আরো স্পষ্ট হয়ে ধরা দিয়েছে, 'মহানগর' গল্পে পতিতাবৃত্তি সেভাবে ধরা না দিলেও একটা ইঙ্গিত তিনি দিয়েছেন, ভাষা বেশ মিষ্টি কাব্যাক্রান্ত, বলার ধরণ অভিনব, মহানগরের পরিচয় বা গ্রামীণ পরিবেশের বর্ণনা অর্থাৎ নদ্মীঅ ঞ্চলের যাবতীয় সৌন্দর্য কাব্যিক ঢঙে বয়ান করা হয়েছে, পোনার নৌকায় চড়ে রতন বেরিয়ে পড়েছে দিদির খোঁজে, যে দিদিকে সে মায়ের মত দেখত, কারণ মা তো অনেক আগেই মরে গেছে, সেই দিদিকে খুঁজতে তার মহানগর যাত্রা, বিয়ের পর দিদি শ্বশুরবাড়ি ছিল কিন্তু পরবর্তীসময়ে দিদি উল্টোডিঙিতে চলে গেছে, রতন গ্রাম্য একটা বালক, কিন্তু তার মধ্যে যে সাহস তাতে সে অনেকখানি সাবলীল এ্ন গল্পে দেখানো হয়েছে, হারিয়ে যাওয়া দিদিকে সে পায় অনেক কষ্ট করে, ভাল্ল বোনের পবিত্র এই ভালবাসা সত্যিই বিস্ময়কর, একসময় রতন বলে, দিদিকে সে নিয়ে যাবে বাড়ি, কিন্তু প্রাথমিকভাবে ঘাবড়ে যায়, কারণ সে তো ফিরে যেতে পারে না, মহানগর তাকে সব কিছু থেকে বঞ্চিত করেছে, দিয়েছে আশ্রয় আর বেঁচে থাকার অবলম্বন। গল্পের মধ্যে লাভ্ল ক্ষতির একটা ফিরিস্তি উঠে এসেছে, রতনকে ফিরে যেতে হয় দিদিকে না নিয়েই, কারণ তার দিদি যে অদ্ভুতভাবে হারিয়ে গেছে মহানগরীর ভিড়ে, জটিল একটা প্রশ্ন শুধু রয়ে যায়, স্বামীর কাছে বা শ্বশুরবাড়ি না থেকে কেন রতনের দিদি চপলা হারিয়ে গেছে অন্ধকার নগরে সে ইতিহাস বড় করুণ, তারপরও মহানগরের ওপর সন্ধ্যা নামে বিস্মৃতির মত গাঢ়।

'সংসারসীমান্ত' গল্পে দুটো চরিত্র প্রতীয়মান, একজন চোর অঘোর দাস এবং অন্যজন পতিতা রজনী, মানুষই চোর হয় আবার এই মানুষই পতিতা হয়ে সমাজদেহে ক্ষতের সৃষ্টি করে। প্রেমেন্দ্র মিত্র মানুষের বিভিন্ন রূপকে দেখেছেন এভাবেই, খদ্দের ধরার আশায় বস্তিবাসিনী রজনী, এবং বৃষ্টিবাদল দু র্যোগের রাতে আশ্রয় নিতে আসা চোর অঘোর, এই দুজন মানব্লমানবী গ ল্পের সত্তা জুড়ে, এদের মধ্যে সত্যিসত্যি ভালবাসাও জন্মে, তা দিনেদিনে আরো প্রগাঢ় হয়। চুরি ছেড়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে রজনীকে নিয়ে কলকাতা ছেড়ে চলে গেলেও চুরি সে ছাড়তে পারেনি, মানবজগতের আদি পেশা চৌর্যবৃত্তি এবং বেশ্যাবৃত্তি, এই দুই পেশার সঙ্গে মানব্লমানবীর প্রেম এবং পালিয়ে যাওয়া, তারপর আবার চুরির দায়ে জেলবাস, মুক্তির স্বপ্ন বিলীন হয়, রজনীকে আবার জীবনের জন্য বেঁচে থাকার জন্য পতিতাবৃত্তি গ্রহণ করতে হয়, হয়তো এটাই বাস্তব সত্য, মানুষ ইচ্ছে করলেই নিজের লেবাস ঝেড়ে ফেলতে পারে না, কোথায় একটা ক্ষতের ঘা রয়ে যায়, এবং তা কষ্ট ছড়ায়। গল্পের শেষপ্রান্তে এসে লেখক পতিতাবৃত্তির অংকন করেছেন এভাবে, 'নিরবচ্ছিন্ন বর্ষার রাতে এখনো নিশ্চয় কলিকাতার একটা কর্দমাক্ত নোংরা ও কুৎসিত পথের ধারে কেরাসিনের ডিবিয়ার ম্লান আলো দেখা যায়, ডিবিয়ার ধূমবহুল শিখাকে শীর্ণ হাতে সযত্নে বৃষ্টির ঝাঁপটা হইতে আড়াল করিয়া গভীর রাত্রি পর্যন্ত এখনো নিশ্চয় বিগতযৌবনা রূপহীনা রজনী একরাত্রের অতিথির জন্য হতাশ নয়নে পথের দিকে চাহিয়া প্রতীক্ষা করে'।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্প যেন পুরনো হয় না, পুরনো হবারও নয়, কারণ মধ্যবিত্তের যে কষ্ট, যে হাহাকার, তারই রূপ বারবার উঠে আসে, বারবার রঙ পাল্টায়, আবার নতুন হয়, মধ্যবিত্ত ঘুরেফিরে আসে বিভিন্ন আঙ্গিকে, বিভিন্ন সমস্যায়, সমস্যাগুলো আরো ঘণায়িত হয়, আর তাই একই গল্প পাঠকের মনোজগতকে নানা সময়ে নানাভাবে নানা আবেগে কাল্লেকা লে দোলা দেয়, দোলায়িত করে, হয়তো এভাবেই প্রেমেন্দ্রের গল্পের বিষয় ও কাহিনি চিরন্তন হয়, আর তাই শাশ্বত ভাবনাকে বিভিন্নসময়ে বিভিন্নভাবে উত্তরোত্তর উজ্জীবিত করে, যা সময়কে সময়ের কাছে নিয়ে আসে, নগর মহানগর সভ্যতা যতদিন থাকবে, যতদিন মধ্যবিত্ত থাকবে, মধ্যবিত্তের হাহাকার থাকবে, মধ্যবিত্তের স্বপ্ন বা স্বপ্ন ভাঙার অথবা গড়ার ইঙ্গিত থাকবে, প্রেমেন্দ্রের গল্প ততদিন বেঁচে থাকবে মানুষের মনে, মানুষকে করে তুলবে আরো সাবলীল এবং তার গল্প ও গল্পের চরিত্রগুলো অনুপ্রাণিত করবে নতুন পথের আলোকে।

আশরাফ উদ্দীন আহ্মদ
শিক্ষাবিদ, প্রাবন্ধিক

উৎসব

যজ্ঞগান

যজ্ঞগান ভারতের কর্নাটক অঞ্চলের লোকনাট্য শিল্পকলা। যজ্ঞগানের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে যজ্ঞের গান। এই লোক শিল্পরূপের ইতিহাস শতাব্দীপ্রাচীন। ভারতের দুই মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনি অবলম্বনে যজ্ঞগান নাটক আকারে পরিবেশিত হয়ে থাকে।

সংগীত, সাহিত্য, নৃত্য, অভিনয়, সংলাপ, অঙ্গসজ্জা– সব মিলিয়ে এ এক সম্পূর্ণ শিল্পকলা। এর গঠনশৈলী অনবদ্য। যজ্ঞগানে মঞ্চের পেছনে থাকেন যন্ত্রী ও গায়কদল, সামনে থাকেন নৃত্য ও অভিনয়শিল্পীদল যাঁরা একযোগে মহাকাব্যের অংশবিশেষ অভিনয় করেন। অভিনেতারা জমকালো পোশাক পরেন, মাথায় থাকে শিরোস্ত্রাণ, মুখাবয়ব নানা রঙে রঞ্জিত। এই শিল্পরূপকে পশ্চিমা দুনিয়ার অপেরার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।

নাট্যকলায় স্নাতক ডিগ্রিধারী আট-সদস্যের এই যজ্ঞগান দলের নেতা শ্রী নাগরাজ যোশীর জন্ম কর্নাটকে। যজ্ঞগানের প্রতি আশৈশব ভালবাসা লালনকারী শ্রী যোশী গত পঁয়ত্রিশ বছর ধরে তাঁর গানের দল 'শবর'-এর মাধ্যমে কয়েকশো যজ্ঞগানের অয়োজন করেছেন।

ভরত-ধর্মাঙ্গদ

এটি অযোধ্যার যুবরাজ ধর্মাঙ্গদের বীরত্বের কাহিনি। যুবরাজ ধর্মাঙ্গদ বিশ্ববাসীকে তাঁর শক্তি প্রদর্শনের লক্ষ্যে যুদ্ধাভিযানে বের হয়েছেন। একে একে অনেক রাজাকে পরাজিত করে তিনি প্রতিষ্ঠাপুরের রাজা ভরতের মুখোমুখি হলেন এবং তাঁকে যুদ্ধে আহ্বান জানালেন। দুই বীরের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হল। যুদ্ধে 'কেহ কারো নাহি জিনে সমানে সমান' অবস্থা। অনেকক্ষণ ধরে যুদ্ধ চলল। ঘোরতর যুদ্ধে জয়-পরাজয় নির্ণয় না হওয়ায় মহর্ষি নারদ শান্তি প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে এলেন। মহর্ষি নারদের পরামর্শে রাজা ভরত তাঁর কন্যার সঙ্গে ধর্মাঙ্গদের বিবাহের প্রস্তাব দিলেন। এভাবে দুই রাজার মধ্যে বৈরিতার অবসান ও মৈত্রীর সম্পর্ক স্থাপিত হল।

যুদ্ধাভিযানের এক পর্যায়ে ধর্মাঙ্গদ পাতালপুরী আক্রমণ করলেন এবং পাতালপুরীর সম্রাট মহাবলীর সম্মুখীন হলেন। দু'জনেই মহাযোদ্ধা, আবার দু'জনেই বিষ্ণুর পূজারী। তাই এবার বিষ্ণু এসে উভয়ের মাঝখানে দাঁড়ালেন এবং যুদ্ধের অবসান ঘটালেন। মহাবলী তাঁর কন্যাকে ধর্মাঙ্গদের হাতে সমর্পণের প্রস্তাব দিলে রাজকুমার তা সানন্দে গ্রহণ করলেন।

এভাবে ধর্মাঙ্গদ বিশ্ববাসীকে তাঁর শক্তি প্রদর্শন করে তাঁর যুদ্ধাভিযান শেষ করলেন।

জাম্ববতী কল্যাণ

এটি ভাগবত থেকে গৃহীত শ্রীকৃষ্ণের কাহিনি। যে মুক্তা থেকে প্রতিদিন স্বর্ণ উৎপন্ন হয়, সেই শ্যামন্তক মণি চুরির দায়ে অভিযুক্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে যে বনে এটি খোয়া গিয়েছিল, সেখানে খুঁজতে শুরম্ন করলেন। এক পর্যায়ে তিনি জানতে পারলেন, এটি জাম্ববানের কাছে গচ্ছিত আছে। অর্ধেক মানব-অর্ধেক ভলস্নুক জাম্ববান রামায়ণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন, একথা আমরা সবাই জানি। যাহোক, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে জাম্ববানের ঘোরতর যুদ্ধ হল। যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ জিতে গেলেন। জাম্ববান ছিলেন রামচন্দ্রের ভক্ত। আবার শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার। তিনি কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর কন্যার বিবাহ দিলেন। গল্পের মধুরেণ পরিসমাপ্তি ঘটল।

লব-কুশ

এটি ভারতীয় মহাকাব্য রামায়ণের রামচন্দ্র ও তাঁর দুই জমজপুত্র লব-কুশের মিলন কাহিনি।

মা সীতা দেবীর সঙ্গে মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে প্রতিপালিত লব-কুশ জানতেন না যে তাঁদের পিতা রামচন্দ্র অযোধ্যার রাজা। একদিন দুই বালক খেলাচ্ছলে রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া বেঁধে রাখলেন। অশ্বমেধের ঘোড়া নির্বিঘ্নে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে এলেই কেবল পৃথ্বীশ্বর হওয়া যায়। যজ্ঞের ঘোড়া বাঁধা পড়ায় রামচন্দ্র এলেন ঘোড়া উদ্ধারে এবং আত্মজের সঙ্গে নিজের অজান্তে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। দুই শিশু রামচন্দ্রের সঙ্গে বীরবিক্রমে যুদ্ধ করলেন। পরিশেষে সীতা এসে তাদের পিতৃপরিচয় জানিয়ে যুদ্ধের অবসান ঘটালেন। রামচন্দ্র দুই বালকের পরিচয় পেয়ে খুব খুশি হলেন– তাদের বুকে টেনে নিলেন। তারপর তাঁদের সবাইকে নিয়ে অযোধ্যায় ফিরে গেলেন।

সুধন্য-অর্জুন

এটি মহাভারতের কাহিনি। কৌরব ও পা-বদের মধ্যে কুরুক্ষেত্র মহারণে পা-বদের বিজয় অর্জনের পর জ্যেষ্ঠপা-ব যুধিষ্ঠির হস্তিনাপুরের রাজা হলেন। পৃথ্বীশ্বর হওয়ার গৌরব অর্জনের জন্য তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করলেন। অশ্বমেধের ঘোড়ার যাত্রা নির্বিঘ্ন করতে তৃতীয়পাণ্ডব অর্জুন ঘোড়ার সঙ্গে গেলেন।

কৃষ্ণভক্ত মণিপুর রাজপুত্র সুধন্য যজ্ঞের ঘোড়ার পথ রোধ করলেন। তিনি জানতেন, অর্জুন বিপদে পড়লে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসবেন। আর তিনি কৃষ্ণদর্শনের সৌভাগ্য লাভ করবেন। অর্জুন ও সুধন্যের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ শুরম্ন হল। যুদ্ধে অর্জুন পরাজিত হলেন এবং সুধন্যবধে কৃষ্ণের সাহায্য প্রার্থনা করলেন। মৃত্যুর আগে ভগবানের দেখা পাওয়ায় সুধন্যের মনোবাসনা পূর্ণ হল। কৃষ্ণের ভক্ত হওয়ায় সুধন্য সানন্দে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে মোক্ষলাভ করলেন। মোক্ষ হচ্ছে পুনর্জন্মের যন্ত্রণারহিত আত্মার চিরশান্তি লাভ।

• নিজস্ব প্রতিবেদন

ছোটগল্প

ফেরা

সুদেষ্ণা দাশগুপ্ত

ফতেহপুর থাকতেই ফোনে খবর পেয়েছিল যে কলকাতায় দু'দিন ধরে তুমুল বৃষ্টি হচ্ছে। কানপুর এয়ারপোর্টেও অপেক্ষা করতে হয়েছে প্রায় ঘণ্টাচারেক, খারাপ আবহাওয়ার জন্য বিমান বিলম্ব। মন্দিরাকে অবশ্য ওর ভাই বিশে আর ভাইয়ের বউ একা কানপুর পর্যন্ত কোনবারই ছাড়ে না, সবাই মিলে হৈ হৈ করতে করতে গাড়িতে ফতেহপুর থেকে কানপুরে আসে। জি টি রোড দিয়ে বেশি দেরি হয় না। বাপের বাড়ি ফতেহপুরের মসওয়ানীতে, একেবারে জি টি রোডের ওপরেই। বছরে প্রতিবারই তিন্নচার বার মন্দিরা বাপের বাড়ি ঘুরে যায়। আর এই অগাস্টে মানে রাখীতে তো আসবেই। এবারও যথারীতি এসেছিল। আজ ফিরছে। আইল সিটে বসে অ্যাপল্লএর আইপড কানে লাগিয়েই দুঘণ্টা কাটিয়ে ফেলল। কলকাতার আবহাওয়া সম্পর্কে আবার পাইলট জানালেন যে খুব বৃষ্টি পড়ছে এই মুহূর্তে। শম্ভু ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে মন্দিরার জন্য অপেক্ষা করছে। লাইন করে বেরনোই যা দেরি। ব্যাগপত্তর মন্দিরা কোনদিনই তেমন নিয়ে যায় না বাপের বাড়ি। নিজের সবরকম জামাকাপড় মজুত থাকে ওখানে। আর বেরোয়ই বা কোথায় ওখানে গিয়ে। দিনের বেলা অফিসআওয়ার্সে তো ক্রমাগত কলকাতা থেকেই ফোন আসে।

কিন্তু যার জন্য সমস্ত কাজ ফেলে ঘন ঘন ফতেহপুরে ছুটে ছুটে আসা, সে তো সারাদিনে দু'টো কথা বলে কিনা সন্দেহ। বাড়িতে যতক্ষণ থাকে ওপরে নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে থাকে। মন্দিরা বোঝে না যে ওকে এড়িয়ে যাবার জন্যই কি শুধু এই ক'দিন বাবুয়া নিজের ঘরের দরজা বন্ধ রাখে নাকি এটাই সে নিজের অভ্যেস বানিয়ে ফেলেছে। জিজ্ঞেস করব করব করেও মা, ভাই কাউকেই অস্বস্তি কাটিয়ে কথাটা আর জিগ্যেস করতে পারেনি।

আর রাতে মা, বাবা, ভাই, ভাইয়ের বউ আর ভাইঝি সবাই মিলে মন্দিরাকে ঘিরে থাকে, গল্পগুজব হয়। কিন্তু যার জন্য সমস্ত কাজ ফেলে ঘন ঘন ফতেহপুরে ছুটে ছুটে আসা, সে তো সারাদিনে দু'টো কথা বলে কিনা সন্দেহ। বাড়িতে যতক্ষণ থাকে ওপরে নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে থাকে। মন্দিরা বোঝে না যে ওকে এড়িয়ে যাবার জন্যই কি শুধু এই ক'দিন বাবুয়া নিজের ঘরের দরজা বন্ধ রাখে নাকি এটাই সে নিজের অভ্যেস বানিয়ে ফেলেছে। জিজ্ঞেস করব করব করেও মা, ভাই কাউকেই অস্বস্তি কাটিয়ে কথাটা আর জিগ্যেস করতে পারেনি।

কলকাতায় নেমে এয়ারপোর্টের বাইরে বেরিয়ে বুঝল, বর্ষাটা বেশ জাঁকিয়েই নেমেছে এবার। শম্ভু হাত নাড়ল বেশ ক'জনের পেছন থেকে। গাড়ি নিয়ে আসতে লাগল আরো মিনিটতিনেক। বৃষ্টির রাত আর প্রায় সাড়ে ন'টা বাজে, তাই শম্ভুকে রাজারহাট দিয়ে যেতে বারণ করল। ভিআইপি রোডে তো আজকাল আগের থেকে যানজট অনেক কমেছে। বাগুইহাটি আর কেষ্টপুরের জ্যাম ছাড়িয়ে এক মিনিটে হুশ করে চলে যাবার কথা কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিল? ফ্লাইওভারটা হয়ে যাওয়াতে তো এখন বুঝতেই পারে না কখন বাগুইহাটি আর কখন কেষ্টপুর পেরিয়ে গেল। না, রাস্তায় প্রচুর লোক। অফিসের দিনে ঠিক সন্ধ্যের পরেই জোর বৃষ্টিটা নেমেছে, শম্ভু জানাল। বাড়ি পৌঁছতে আজ বেশ বেগ পেতে হবে মনে হচ্ছে। বৃষ্টি মানেই তো কলকাতায় মারাত্মক ট্র্যাফিক জ্যাম বেড়ে যাবে। মন্দিরা এটা লক্ষ্য করেছে এখানে আসা ইস্তক। আর আজ তো প্রায় ভাসছে শহর। এদিকে বর্ষা বেশি, মন্দিরার বাপের বাড়ির দিকে তো এখনও সবাই 'বারিশ্' এর জন্য হ্যাপি ত্যেশ করে বসে আছে। দুএকদিন নাকি ক'ফোটা পড়েছে, ওদিকের কথায় 'বুন্দাবান্দি', মানে ঐ ভেজা মাটির সোঁদা গন্ধ বেরোতে না বেরোতেই থেমে গেছে বৃষ্টি। বৃষ্টির ফোঁটাও শুষে নিয়েছে শুকনো খটখটে মাটি। ভাইয়ের মেয়েটা যা টড়টড়ি হয়েছে, ওর কাছেই এসব গল্প শোনা মন্দিরার।

– শম্ভু ...

– জী ভাবিজী

– এস্লিটা একটু কমি য়ে দাও তো

– জী

শাড়ির আঁচলটা গায়ে ভাল করে জড়িয়ে নিল মন্দিরা, শীতশীত করছে যেন। বৃষ্টির ছাঁট আসছে নয়তো এ্লসি ব ন্ধ করে জানলা খুলে দিতে বলত। চিংড়িঘাটার কাছটায় সিগন্যালে অনেকক্ষণ দাঁড়াতে হচ্ছে। প্রথম সিগন্যাল সবুজ হয়ে একটু এগিয়ে আবার এইখানেই আরেকটা লালবাতি জ্বলল। দিনের বেলা এই সিগন্যালে খুব রবীন্দ্রসংগীত বাজে, এখন এই ঝমঝমে বৃষ্টিতে সব বন্ধ। যদিও প্রচুর গাড়ি আর অফিসফেরতা মানুষ অপেক্ষা করছে বাসের জন্য। একটা এ্লসি বা সের পেছনে পড়ে গেছে শম্ভু। বাসটা যাত্রী নিচ্ছে। সামনে ভীড়ের মাঝে ও কে? কেমন যেন চেনা চেনা লাগছে। চমকে ওঠে মন্দিরা। জিতুর মত কে? জিতু? ঘাড়টা বাঁদিকে ঝুঁকিয়ে দেখতে চেষ্টা করে। ততক্ষণে সামনের বাস ছেড়ে দিয়েছে আর দাঁড়ান যাত্রীরাও বাসে উঠে পড়েছে। জিতু কি করে হয়? শম্ভুকে জিগ্যেস করবে সে দেখেছে কিনা? উফ! কি যে পাগল মন্দিরা। নিজেকেই ধমক দিয়ে উঠল। কোনমতেই শম্ভুকে এসব উদ্ভট কথা জিজ্ঞেস করা যাবে না। আর মন্দিরা বোঝে পুরনো কর্মচারীরা যতই ঘাড় নীচু করে 'জী ভাবিজী, জী ভাবিজী' করুক, মনে মনে এরা কেউ মন্দিরাকে পছন্দ করে না।

রুবির মোড়ে আইল্যান্ডের ডান দিকে ঘোরার পরে যেন গাড়ি খানিক গতি পেল। আর বেশি সময় লাগবে না। মোবাইলটা নাড়াচাড়া করতে করতে মন্দিরা জিতুর বউ সীমার নাম্বারটা বার করে ফেলেছে। মন্দিরা নিজেই বোঝে না এসব ও কেন করতে চাইছে। রাস্তার ঐ ছেলেটিকে দেখে? ও তো জিতু হতে পারে না। শেষ পর্যন্ত নাম্বারটা টিপেই দিল। রিং হচ্ছে। ধরবে? নাকি ধরবে না? উফ!

– হ্যালো। কে সীমা?

– জানোই তো যে আমার নাম্বার।

– কেমন আছিস সীমা ?

– হঠাৎ?

– না এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, কসবা ক্রস করলাম তোর কথা খুব মনে পড়ল... তারপর জানিস তো...।

– না জানি না আর জানতেও চাই না। হঠাৎ আমার ওপর দরদ এত উথলে উঠল কেন বুঝছি না তো।

– কি যে বলিস! দরদ ওথলানোর কি, এদিক দিয়ে যাচ্ছি, আমি কাকীমা, খুড়শ্বাশুড়ী তোর, ফোন করতে পারি না তোকে?

– থামো! রাতদুপুরে আর ন্যাকামো করতে হবে না। শোনো আমাকে খেটে খেতে হয়। আর এদিক দিয়ে যখন যাচ্ছ, দেখছ নিশ্চয়ই যে কসবায় কেমন জল জমেছে। আমাকে এসব ডিঙিয়ে কাল সকালে বেরোতে হবে। কোন লাক্সারি গাড়ি আমার জন্য অপেক্ষা করবে না। পাবলিক বাসে আমায় যেতে হবে। এই সব ন্যাকা ফোনটোন আর করবে না।

ওদিকে ফোন কেটে দেবার সঙ্গে সঙ্গে কল এন্ড্রএর মেসেজ ভাসতে লাগল মোবাইল স্ক্রিনে। জেনেশুনে এই কাজ আর কতদিন তুমি করবে মন্দিরা নিজেই? আইপডে গানটা আবার চালাল। আর বেশি দেরি নেই যোধপুর পার্ক পৌঁছতে। গড়িয়াহাট ছাড়াচ্ছে মন্দিরার ইনোভা।

ওয়ো যো হমমে তুমমে করার থা...

তুমহে ইয়াদঁ হো কি ন ইয়াদঁ হো

অন্যান্য অফিসের দিনে বারোটার পরেই মন্দিরা অফিস পৌঁছয় কিন্তু পাঁচ দিন টানা কলকাতায় না থাকায় আজ প্রথম দিকে অফিস গিয়ে দু'টোর পরে ফ্যাক্টরিতে এক

চিংড়িঘাটার কাছটায় সিগন্যালে অনেকক্ষণ দাঁড়াতে হচ্ছে। প্রথম সিগন্যাল সবুজ হয়ে একটু এগিয়ে আবার এইখানেই আরেকটা লালবাতি জ্বলল। দিনের বেলা এই সিগন্যালে খুব রবীন্দ্রসংগীত বাজে, এখন এই ঝমঝমে বৃষ্টিতে সব বন্ধ। যদিও প্রচুর গাড়ি আর অফিসফেরতা মানুষ অপেক্ষা করছে বাসের জন্য। একটা এ্লসি বা সের পেছনে পড়ে গেছে শম্ভু। বাসটা যাত্রী নিচ্ছে। সামনে ভীড়ের মাঝে ও কে? কেমন যেন চেনা চেনা লাগছে। চমকে ওঠে মন্দিরা। জিতুর মত কে? জিতু? ঘাড়টা বাঁদিকে ঝুঁকিয়ে দেখতে চেষ্টা করে।

অফিসে ঢুকে যথারীতি দেখে মহিলা কর্মচারীরা প্রায় সকলে উপস্থিত হলেও পুরুষদের বিশেষ কেউই এখনো আসেনি। নিজের চেম্বারে ম্যানেজিং ডিরেক্টরের চেয়ারে বসে 'বাবুজী'র দেয়ালে টাঙানো বড় ছবিটায় অভ্যেসবশত চোখ পড়ে, তক্ষুণি চোখ নামিয়ে নেয়। সিসিটিভিটায় গত ক 'দিনের রেকর্ডটা একটু পরে চালিয়ে দেখে নিতে হবে। জানে ক'দিন বেশ হুল্লোড়ই হয়েছে অফিস জুড়ে। এই ব্যাপারটা মন্দিরা কিছুতেই কন্ট্রোলে আনতে পারছে না। দুএকজন কে টার্মিনেট করেও দেখেছে। এদের যেন কোন ভয়ডরও নেই।

চক্কর দেওয়ার ইচ্ছে আছে। যদিও নীরজের সঙ্গে সারাক্ষণই যোগাযোগ রেখেছিল। ফ্যাক্টরিইন্নচাজ´ তিওয়ারিও সন্ধ্যে সাতটানাগাদ রিপোর্ট করতে একদিনও ভোলেনি। তবু যতক্ষণ পর্যন্ত না অফিস পৌঁছে নিজের জায়গায় গিয়ে বসতে পারছে ততক্ষণ যেন শান্তি পায় না মন্দিরা। আর তাছাড়া 'বাবুজি'ও ঠিক এইভাবে অফিসের ব্যাপারে উতলা হতেন। কোম্পানিই ধ্যান্ন জ্ঞান ছিল। সে তো মন্দিরা নিজের চোখেই দেখেছে। 'বাবুজী'কে অন্ধের মত অনুকরণ করা ছাড়া তো আর কিছুই করার নেই তার। অফিসে ঢুকে যথারীতি দেখে মহিলা কর্মচারীরা প্রায় সকলে উপস্থিত হলেও পুরুষদের বিশেষ কেউই এখনো আসেনি। নিজের চেম্বারে ম্যানেজিং ডিরেক্টরের চেয়ারে বসে 'বাবুজী'র দেয়ালে টাঙানো বড় ছবিটায় অভ্যেসবশত চোখ পড়ে, তক্ষুণি চোখ নামিয়ে নেয়। সিসিটিভিটায় গত ক 'দিনের রেকর্ডটা একটু পরে চালিয়ে দেখে নিতে হবে। জানে ক'দিন বেশ হুল্লোড়ই হয়েছে অফিস জুড়ে। এই ব্যাপারটা মন্দিরা কিছুতেই কন্ট্রোলে আনতে পারছে না। দুএকজন কে টার্মিনেট করেও দেখেছে। এদের যেন কোন ভয়ডরও নেই। এদের 'ম্যাডাম, ম্যাডাম'এর আড়া লে প্রচ্ছন্ন তাচ্ছিল্য তার প্রতি, এটা যেন মন্দিরা বেশ টের পায়। বেল বাজাতেই রাকেশ ঢোকে। ওকে এক কাপ কফি বানাতে বলে অ্যাটেন্ডেন্স রেজিস্ট্রারটা আনতে বলে।

এবার একে একে ছেলেরা ঢুকতে শুরু করেছে। 'সিং ফিটিংস প্রাইভেট লিমিটেড'এ বেশির ভাগ কর্মচারীই আসে গঙ্গার ওপার থেকে, অর্থাৎ হাওড়া ছাড়িয়ে বিভিন্ন মফস্বল থেকে। একটা বেশ পুরনো হয়ে যাওয়া পোর্টফোলিও নিয়ে ঢুকেই রাকেশকে হাঁক পাড়লেন দুবেজী।

– রাকেশ দুগ্লাস জল দাও তো...

জুঁই মুখটা যথাসম্ভব নামিয়ে গলা চেপে বলল

– ও দুবেজী... রেজিস্ট্রার তো ভেতরে চলে গেছে। সব্বাইকে অ্যাবসেন্ট দেবে আজ

– তাই নাকি জুঁই? আরে আমি তো কতদিন সই করি না রেজিস্ট্রারে...

– যেমন করেন না তেমন বুঝুন। রানীসাহেবা তো মুখ হাঁড়িতোলা করে ঢুকেছেন আজ।

– হাঁড়িতোলা কি জুঁই?

– আরে মুখখানা হাঁড়ি করে ঢুকেছেন। গোমড়ামুখ, বুঝেছেন?

কমার্শিয়াল ম্যানেজার দুবেজী ছোটোর থেকেই বাংলায়, ভাল বাংলা জানেন, কিন্তু কোন কোন শব্দে হোঁচট খান। অফিসের শুরুতে জল, চায়ের মত দুবেজী আর জুঁইয়ের খুনসুটিও রোজকার ব্যাপার। সবাই উপভোগ করে।

– তা জুঁই, আমাদের নতুন ম্যানেজিং ডিরেক্টর ঐ অ্যাটেন্ডেন্স রেজিস্ট্রার ছাড়া আর কি বুঝবে?

হাসির রোল ওঠে সারা অফিসজুড়ে। আর সঙ্গে সঙ্গে দুবেজীর টেবিলের ইন্টারকম বেজে ওঠে।

– নমস্কার ম্যাডাম।

– ...।

– দেখছি।

– ...।

– আচ্ছা।

বলেই দুবেজী ফোনটা নামিয়ে রাখে। দুবেজীর স্বভাবই হচ্ছে সবকিছুতেই 'হয়ে যাবে হয়ে যাবে' বলা, যে কমিটমেন্ট তিনি সময়মত কখনোই রাখতে পারেন না।

ওদিকের টেবিলে সহেলি মন দিয়ে ব্যাংক্করিকনসিলি য়েশন করছে। যদিও দুবেজীর কথা ন্ম শুনে উপায় নেই। সারা অফিস শুনতে পাচ্ছে। হয়তো বা চেম্বারের ভেতরে ম্যাডামও। দুবেজী এবার সহেলীর পেছনে লাগতে শুরু করলেন।

– আরে ও সহেলি, কি কাজ করছেন এত মন দিয়ে? শুনুন না...

– হ্যাঁ গুড়মর্নি´ং দুবেজী, বলুন।

– বলছি... আপনারা কি করলেন বলুন তো! এই আপনি, মিসেস ব্যানার্জি আপনারা...।

সহেলি চুপ করে ওঁর পরের কথার অপেক্ষা করল।

– বলছি আপনারা তো কেউ একটা মালদার শ্বশুর পাকড়াও করতে পারলেন না, জুঁই..., তোমার তো এখনও বিয়ে হয়নি, দেখছই তো চারদিকে তাকিয়ে, এমন বাড়িতে বিয়ে করবে শ্বশুর যেন মালদার হয়।

জুঁই চুপ করে থাকার পাত্রী নয়।

– শ্বশুর মালদার হলেই তো হবে না, তিনি সময়মত অক্কা পাবেন তবে তো...

– অক্কা মানে?

– উফ দুবেজী! অক্কা! অক্কা! পটলডাঙার টিকিট কাটার কথা বলছি। মর জানা, মর জানা...।

– হ্যাঁ সে তো (একটু গলা নামিয়ে) তোমার হাতে, তারপরে...

মিসেস ব্যানার্জি ওদিক থেকে সবাইকে ধমক দিলেন। এই অফিসের সবচাইতে সিনিয়র স্টাফ। তাই সবাই খানিক মান্যিগন্যি করে।

সহেলি এখানকার অন্যদের মত অত পুরনো নয়। তাও 'শ্বশুর' সম্পর্কে যে ঠাট্টাটি হচ্ছে, সেই লোকটি সম্পর্কে বেশ খানিকটাই ওয়াকিবহাল। আর সকলের মতই একটা ভয়শ্রদ্ধা মিশ্রিত ভাললাগা ছিল বৃদ্ধ ম্যানেজিং ডিরেক্টরের প্রতি সহেলিরও। স্যারের সম্পর্কে অনেক গল্পও শুনেছে। কোম্পানিগতপ্রাণ ছিল সিং সাহেবের। সাইকেলের পেছনে নাট্ট বোল্টের এবং আরো নানা ফিটিংসের স্যাম্পেল নিয়ে নিয়ে ঘুরেছেন নাকি প্রথম জীবনে। তা থেকেই ধীরে ধীরে এই বিশাল আকারের কোম্পানি। কত জায়গায় এক্সপোর্ট হত আশির দশকে। হাওড়ায় তিন্নতিন টে ফ্যাক্টরি। কিন্তু বয়েস হতে না হতেই নানা উপদ্রব শুরু হল। শুগার, হাই ব্লাড প্রেশার। এছাড়া দুটো ছেলের একটাও মানুষ হল না। বিয়েশাদি সবই দি য়েছেন সময়মত, ছেল্লে মেয়েও হয়েছে। হলে কি হবে, দুটোই আকাট মুখ্যু। শুধু আষ্টেপৃষ্টে গিলতে পারে। আর ভালবাসে সই করতে। স্যারের বড়ছেলে তো শুধু একটার পর একটা অ্ম দরকারি সার্কুলার বার করত আর গুচ্ছের বার সই করত। তবে ছোট ছেলের বউ মন্দিরাকে স্যার যেদিন প্রথম নিয়ে আসেন, সহেলির মনে আছে। কে বলবে স্লেদি নের সেই মন্দিরা আজ এই হয়েছে।

স্যারের পেছনে পেছনে জড়োসড়ো, গায়ে আঁচল পেঁচিয়ে ছোটছেলের স্ত্রী মন্দিরাকে অফিসে ঢুকতে দেখে অফিসশুদ্ধু লোকের হাতের কাজ থেমে গেছিল। তারপরেই সহেলির টেবিলের ইন্টারকমে

আজ আঠারোটা বছর ধরে মন্দিরার যা যা কাজ সব এই লোকটার হাত ধরেই। একা কিছুই করেনি। সব প্ল্যান দুজনের। শ্বশুরবাড়ির কাউকে কখনও নিজের মনে করেনি মন্দিরা এই নীরজকে ছাড়া। বিয়ের পর পর দেখত একটা সুন্দর দেখতে ছেলে শ্বশুরবাড়ি আসে। নিজের স্বামী বা ভাসুরের থেকে একেবারেই আলাদা। ল্যাল্লা ক্ষ্যাপা মার্কা নয়। ওদের মামার ছেলে। তারপর প্রায় দুবছর মন্দিরার বাচ্চা হবার কোন সম্ভাবনাই যখন দেখা দিল না তখন শাশুড়ি প্রায়ই নীরজকে বাড়িতে ডাকতে লাগলেন, আর তখন নানা কাজের অছিলায় জাকে নিয়ে বেরিয়ে যেতেন বাড়ি থেকে।

স্যারের ফোন। সহেলি এম ডির চেম্বারে ঢুকতে, মন্দিরার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে স্যার বললেন, সহেলি যদি মন্দিরাকে নিজের পাশে বসিয়ে কম্পিউটারে অফিসের কিছু কাজটাজ দেখিয়ে দেয়। সেই শুরু মন্দিরার এই অফিসে। আর সিংসাহেবও নিজের শেষের বীজ পুঁতেছিলেন সেই দিনই। ততদিনে অবশ্য স্যারের ছোটছেলে বিনোদ বিছানা নিয়েছে। নার্ভের অসুখ নিয়েই জন্মেছিল বিনোদ। আর মাথাও তেমন ঠিক বলা যায় না, অন্তত সহেলি যতদিন দেখেছে। সহেলি বোঝে, মন্দিরার মাবাবা আসলে শ্বশুরবাড়ির বিষয়আশয় দেখেই বিয়েটা দিয়েছিলেন। নয়তো বিনোদতো কোনদিনই সুস্থ স্বাভাবিক নয়। অর্ধেক কথাও বোঝা যায় না তার। বিনোদমন্দিরার ছেলে বাবুয়ার ব্যাপারেও নানা কানাঘুষো সহেলির কানে আসে।

এরপর থেকে মন্দিরা নিয়মিত অফিসে আসতে শুরু করে। কখনও সিংসাহেবের সঙ্গে, কখনওবা খানিক পরে। বেশি দেরি করলে স্যার সহেলিকে ফোন করে জানতে চাইতেন যে মন্দিরা এসেছে কিনা, তেমনই মন্দিরা যদি তাড়াতাড়ি অফিস থেকে বেরিয়ে যেত স্যার বিরক্ত হতেন, এটা অফিসের সকলে বুঝত। মন্দিরাকে নাকি মাঝে মাঝে দেখা যেত নীরজের গাড়িতে। নীরজ, সিংসাহেবের শালার ছেলে। সহেলির মাঝেমাঝেই খুব কষ্ট হত স্যারের অসহায়তা দেখে। বিপত্নীক এই মানুষটি আর কতদিকে নজর দেবেন? স্ত্রী না থাকলেও, বাড়িতে তো ভরা সংসার। দুই ছেলে, দুই বউমা, নাতি, নাতনি, কিন্তু তাও যেন একেবারে একা। হাই ব্লাড প্রেশার আর শুগার শরীরে শক্তভাবে চেপে ধরল, ছোটছেলে বিনোদ মারা যাবার পরেই। নিজের জোর আর কন্ট্রোল সবই শিথিল হতে শুরু করল চরমভাবে। মন্দিরা নির্ভয়ে নীরজের সঙ্গে ঘোরাঘুরি করে, তবে অফিসের ব্যাপারে সে হঠাৎ খুব সিরিয়াস হয়ে পড়েছে। আর বিনোদ মারা যাবার পর সে হয়েছে ডিরেক্টর। শ্বশুরও অসুখের জন্যেই হোক বা নিজের নির্ভরতার জন্যেই হোক মন্দিরাকে আস্তে আস্তে সব ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছিলেন। অফিসে অনেকে বলতেন যে, মন্দিরা ইচ্ছে করেই সিংসাহেবকে শেষের দিকে আর অফিসে আসতে দিত না। বাড়িতেও কেউ দেখতে যাক, সে পছন্দ করত না। মন্দিরার এর পরের কাজটিই হচ্ছে সবচেয়ে চমকপ্রদ। সিংসাহেব মারা যাবার পরে পরেই কিভাবে পেছনের তারিখের সব নথিপত্র তৈরি করিয়ে নিজে ম্যানেজিং ডিরেক্টর হয়ে বসা আর ভাসুরকে নামমাত্র শেয়ার দেওয়া। ভাসুরপোকে তো কিছুই দেয়নি। তার বাবুজি নাকি এইসব করে গেছেন নিজের মৃত্যুর আগে আগে।

বাবুয়া বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে চোখে মুখে নীরজের আদল ফুটে উঠতে লাগল। নীরজ বেশ সুপুরুষ। জিম করা শরীর। ততদিনে নীরজও হয়েছে সিং ফিটিংসএর জেনারেল ম্যানেজার। যদিও ফ্যাক্টরিতেই সে বেশি থাকে, মন্দিরা বসে অফিসে।

– দিদি ম্যাডাম আপনাকে ডাকছেন

রাকেশের ডাকে সম্বিৎ ফেরে সহেলির। ম্যাডামের ঘরে ঢোকে।

– কি সহেলি অ্যাকাউন্টের কাজ কদ্দুর?

– অ্যাকাউন্টস মানে কি এমা সের সেলটা জানতে চাইছেন? নাকি আউটস্ট্যান্ডিং পেমেন্ট?

– না না, অগাস্ট মাস তো চলছে ব্যালেন্সশিট ক বে বেরোবে?

– সে তো ম্যাডাম রায়বাবু বলবেন, এখনও তো আমায় কোন স্টেটমেন্ট চাননি। আমি কারেন্ট ইয়ারের কাজ করছি। জুলাই পর্যন্ত ফিগার সব আপটুডেট।

– বাবুজীর সময়ও দেখতাম আপনারা সেই সেপ্টেম্বরঅ ক্টোবরে ব্যালেন্সশিট বানা তেন, কেন এত দেরি কেন করেন? মার্চে বছর শেষ হয়।

– ট্যাক্স তো দেওয়া আছেই ম্যাডাম, ব্যালেন্সশিট অ ক্টোবরের মধ্যে সাবমিট করলেই হয় ম্যাডাম, তারপর থেকে ফাইন লাগে।

– ঠিক আছে, কাল আপনি অডিটারকে ফোন করে আসতে বলুন। রায়বাবু, আপনি কাল একটায় একটা মিটিং কল করুন। রিপোর্ট নিয়ে বসুন আমার চেম্বারে।

– ওকে ম্যাডাম।

সত্যিই রায়বাবু কেন যে বসছেন না, ভাল লাগে না সহেলির।

ঠিক বিকেল পাঁচটায় ফ্যাক্টরিতে ঢুকল মন্দিরা। লেবাররা চলে গেছে সবাই। ফ্যাক্টরি চারটেয় ছুটি হয়। সকাল আটটা থেকে খোলে। তিওয়ারি বসে বসে স্টক মেলাচ্ছে। মন্দিরা ঢুকল। খুব গম্ভীরভাবে স্টক স্টেটমেন্টে চোখ বোলাল। এসব তেমন বোঝে না সে যদিও। তাও ভাবেভঙ্গিতে সেটা বুঝতে দেয় না। আরো দুচার টে দরকারি কথা সেরে নীরজের চেম্বারে ঢোকে। নীরজ কম্পিউটারে সলিটেয়ার খেলছে। মন্দিরা একটা চেয়ারে বসে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। সামনে বসা লোকটাকে দেখে, মন্দিরার থেকে ক'বছরের ছোট। কোন কিছুতেই যেন হেলদোল নেই মানুষটার। আজ আঠারোটা বছর ধরে মন্দিরার যা যা কাজ সব এই লোকটার হাত ধরেই। একা কিছুই করেনি। সব প্ল্যান দুজনের। শ্বশুরবাড়ির কাউকে কখনও নিজের মনে করেনি মন্দিরা এই নীরজকে ছাড়া। বিয়ের পর পর দেখত একটা সুন্দর দেখতে ছেলে শ্বশুরবাড়ি আসে। নিজের স্বামী বা ভাসুরের থেকে একেবারেই আলাদা। ল্যাল্লা ক্ষ্যাপা মার্কা নয়। ওদের মামার ছেলে। তারপর প্রায় দুবছর মন্দিরার বাচ্চা হবার কোন সম্ভাবনাই যখন দেখা দিল না তখন শাশুড়ি প্রায়ই নীরজকে বাড়িতে ডাকতে লাগলেন, আর তখন নানা কাজের অছিলায় জাকে নিয়ে বেরিয়ে যেতেন বাড়ি থেকে। এরপর থেকে মন্দিরা নিজের গরজেই আর নীরজকে কাছছাড়া করেনি।

– কি হল? আমি এতদিন পর এলাম, কম্পিউটার থেকে মুখ সরাতেও ইচ্ছে করছে না?

– ও হ্যাঁ, বল ভাবি।

– বল ভাবি মানে? এত ঠাণ্ডা রিসেপশন?

– ও কে, বল কি করতে পারি তোমার জন্যে? বান্দা হাজির তোমার সামনে।

– তুমি হাজির? না আমি হাজির হয়েছি তোমার সামনে?

কম্পিউটারের মনিটর থেকে চোখ না সরিয়েই উত্তর দেয় নীরজ।

– আমাকে দেখতে এসেছ না কি নিজের বাগানো রাজ্যপাট দেখতে মহারানী এসেছেন?

– তুমি তখন থেকে এমন ট্যাঙস্লট ঢাঙস কথা শোনাচ্ছ কেন বল তো নীরজ? একবারও ছেলের কথা জিজ্ঞেস করলে না তো?

– ছেলের কথা? ও বাবুয়া? সাহেবজাদা কেমন আছে?

– সাহেবজাদা যখন তখন সাহেবের মতই আছে। তোমার রকম সকম তো সাহেবের থেকে কিছু কম না।

মাউস আর মনিটরে নিমগ্ন মানুষটাকে দেখে মন্দিরার কেমন যেন একটু ভয় ভয় করে। মন্দিরা যত ওকে আঁকড়ে ধরতে চায়, ততই যেন ও ফাঁক্ক ফোকর খোঁজে পালাবার। সমস্ত শ্বশুরকূলকে প্রায় বঞ্চিত করেছে মন্দিরা এই লোকটার কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। একটার পর একটা নিজের মিশন সাকসেসফুল করে তুলেছে। ভাগ্যদেবীও বড় প্রসন্ন মন্দিরার প্রতি। কিন্তু মাঝে মাঝে আজকাল হাঁফ লাগে। কার জন্যে? কিসের জন্যে? বাবুয়া তো একটা কথাও বলে না মার সঙ্গে।

– আরে না না আমি সাহেব বলতে বিনোদভৈয়াকে বলেছি। আমি আবার কি সাহেব?

– কেন এভাবে বল তুমি নীরজ? আমি তো বলেছি আসছে ফিন্যান্সিয়াল ইয়ারে আমি তোমায় ডিরেক্টর বানাচ্ছি।

মাউস আর মনিটরে নিমগ্ন মানুষটাকে দেখে মন্দিরার কেমন যেন একটু ভয় ভয় করে। মন্দিরা যত ওকে আঁকড়ে ধরতে চায়, ততই যেন ও ফাঁক্ক ফোকর খোঁজে পালাবার। সমস্ত শ্বশুরকূলকে প্রায় বঞ্চিত করেছে মন্দিরা এই লোকটার কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। একটার পর একটা নিজের মিশন সাকসেসফুল করে তুলেছে। ভাগ্যদেবীও বড় প্রসন্ন মন্দিরার প্রতি। কিন্তু মাঝে মাঝে আজকাল হাঁফ লাগে। কার জন্যে? কিসের জন্যে? বাবুয়া তো একটা কথাও বলে না মার সঙ্গে। মন্দিরা বার বার ছুটে ছুটে যায় ফতেহপুর, কিন্তু বাবুয়া যেন কেমন দূরে সরে যাচ্ছে। এখানে, কলকাতায় বিগড়ে যাচ্ছিল তাই ফতেহপুরে মামাবাড়ি রেখে পড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। কিন্তু আখেরে কতটা কি ভাল হয়েছে, মন্দিরা এখনও সেটা বুঝে উঠতে পারেনি। যাকগে! আর ভাবতে পারে না। ক্লান্ত লাগছে বড়, এবার উঠতে হবে।

– তুমি কি আমার সাথে ওবাড়ি যাবে নীরজ? আজ থাকবে ওখানে?

– না ভাবি আমি আর গিয়ে কি করব? আর খানিকক্ষণ ফ্যাক্টরিতেই থাকি, তারপর বাড়ি চলে যাই। মায়ের শরীরটাও ভাল যাচ্ছে না আবার।

– আজেবাজে অজুহাত দিও না তো। আমি চললাম।

দরজায় হ্যাচ লক, ত্মও গা য়ের জোরে টেনে মন্দিরা বন্ধ করল দড়াম করে। হনহন করে হেঁটে গাড়িতে গিয়ে উঠল। গাড়িতে উঠে মাথা হেলিয়ে দিল হেড রেস্টে। নীরজও যেন কেমন এড়িয়ে এড়িয়ে চলছে আজকাল। বাবুয়ার ব্যাপারে কোন চিন্তাই ওর নেই। মাঝে মাঝে ভাবে নীরজকে কোম্পানির ডিরেক্টর বানানোর সঙ্গে সঙ্গেই রেজিস্ট্রিটাও সেরে রাখবে। কিন্তু যে বাবুয়া আগে নীরজের খুব নেওটা ছিল, বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে নীরজকে কেমন অপছন্দ করছে। নীরজও গ্মছাড়া। এসব দেখে, মন্দিরাই ওর মধ্যে ডিরেক্টর হবার বাসনা ঢুকিয়েছে। ধীরে ধীরে নীরজ আর বাবুয়াকে নিয়ে মন্দিরা যে পাহাড়ের চূড়োয় পৌঁছতে চাইছে, তা কি সম্ভব হবে না?

অনেক কষ্টে দ্ধকাঁ ধে দুটো ব্যাগ নিয়ে বাস থেকে নিজেকে টেনেহিঁচড়ে নামাল সীমা। তবু রক্ষে আজ বৃষ্টি নেই। তাই রাস্তার জলও কমেছে। কসবা বাস স্টপে নেমে বেশ ভেতরে ওদের ফ্ল্যাট। শাশুড়ি অপেক্ষা করছিলেন। বেল বাজানোর সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেল। সারাদিন একা একা থাকেন আর দুশ্চিন্তা করেন।

– এত দেরি যে ? চা বানাই সীমা?

– হ্যাঁ বানাও মা।

শাশুড়ি বৌমার সম্পর্ক খারাপ কখনোই ছিল না। আর এখন যেন দুজন দুজনকে আঁকড়ে থাকে।

– কাল রাতে মনে হল যেন ঐ রাক্ষুসীটা তোকে ফোন করেছিল সীমা।

– হ্যাঁ, কাকিমা ফোন করেছিল ।

– খবরদার কাকিমা বলবি না ঐ হারামজাদীকে।

– মা চুপ কর না। তোমায় কত বলি এসব বলে কোন লাভ নেই।

– কলমুহি! সারা পরিবারকে খেয়ে ফেলল, ব্যভিচারিণী।

– মা আমি ক্লান্ত গো...

– সীমা আমি চা আনছি মা। তুই বুঝিস না আমার ব্যথা? তোর শ্বশুর তো এই শোকেই চলে গেল। সেদিনের মেয়ে শ্বশুরভাসুর ভাসুরপো মায় স্বামীকে পর্যন্ত খেল! ওকি ভাবছে বাবুয়াকে নিয়ে ও সুখে থাকবে?

– মা আমরা কেন অভিশাপ দেব বল তো? আমরা তো স্বজনহারার কষ্ট তিলে তিলে পাচ্ছি। আর কেউ সেটা পাক তা কেন চাইব বল তো।

– মন্দিরা রাক্ষুসী। ও আমাদের শ্বশুরের ভিটেছাড়া করিয়েছে...

– করাক। ভগবান তার বিচার করবে... ছাড়ো... মা চা তেতো হয়ে যাবে গো।

– হ্যাঁ হ্যাঁ।

শাশুড়ির জ্বালা, দুঃখ সীমা বোঝে। নিজের কষ্ট, হাহাকার চেপে রাখলেও তার চোখেমুখে তা ধরা পড়ে। কতদিন ঘুমোতে পারে না। ঘুমোলেও ঝটকা লেগে ঘুম ভেঙে যায় বারবার। শুধু আগুন, চারদিকে আগুন জ্বলছে যেন দেখে, আর তারপরই এক লম্ম্চওড়া মানু ষের আদল জ্বলন্ত, পাক খেতে খেতে নিচে পড়ে যাচ্ছে। উফ, ধড়মড় করে সীমা জেগে ওঠে রোজ। সারা শরীর কাঁপে। ঘামে ভিজে যায় বুক্পিঠ।

একুশ বছরের সীমা বিয়ের পর যখন শ্বশুরবাড়ি এসেছে, ততদিনে মন্দিরার স্বামী মানে খুড়শ্বশুর মারা গেছেন। সীমার নিজের শ্বশুরও প্রায় শয্যাশায়ী। দাদাশ্বশুর মন্দিরার হাতের পুতুল হয়ে আছেন। মন্দিরা পুরোদমে অফিস ও বাড়িতে কর্তৃত্ব করে চলেছে। সীমার নিজের শাশুড়ি মায়া পড়াশুনো তেমন জানেন না। বাড়ি বসে মন্দিরার আড়ালে শুধু গজগজ, খিটখিট করেন। সীমার কেমন অদ্ভুত মনে হত সব। বাড়ির সব কটা পুরুষ কেমন যেন বোকাহাবা। খায়, ঘুমোয়, ব্যাস। এছাড়া যেন আর কোন কাজ নেই। তবে দাদাশ্বশুরকে যতটুকু দেখেছে তাতে বুঝতে পেরেছিল যে, ঐ লোকটা সত্যিই আলাদা। কিন্তু হলে কি হবে, মন্দিরা ছাড়া তো দাদুর ঘরে কেউ ঢুকতেই পারত না তেমন। এছাড়া সীমার মনে হয়েছে মন্দিরা অফিস্ল বেরোনোর আগে দাদুকে দুপুরের খাবার খাইয়ে কোন কড়া ডোজের ঘুমের ওষুধ খাইয়ে যেত। আয়া একজন ছিল নামকে বাস্তে। সেও এদিকে তেমন আসত না। সীমার বর বছর বাইশের জিতু, ভাল পোশাক্কআশাক, খাওয়্মদাওয়া, আর ব ন্ধুবা ন্ধব নিয়েই ব্যস্ত থাকত। মন্দিরার ব্যাপারে কখনও কখনও বিষোদ্গার করত ঠিকই, কিন্তু তা বন্ধ ঘরে সীমার কানের কাছেই সীমাবদ্ধ থাকত। আসলে কারোও কোন প্রতিবাদ ছিল না। এভাবেই চলছিল। হঠাৎ একদিন বেশ রাতের দিকে বারোটা কি সাড়ে বারোটা হবে নীরজ ঢুকল বাড়িতে, সঙ্গে আর দুজন লোক, স্ট্রেচার হাতে। মন্দিরা বাড়ির কাউকে কিছুই জানায়নি যে দাদুর বাড়াবাড়ি হয়েছে। দাদুকে নিয়ে গেল স্ট্রেচারে তুলে। ছ'দিন পরে ফিরলেন দাদু সাদা চাদরে ঢাকা। সঙ্গে মন্দিরার কি আকুল্লিবিকুলি কান্না। আর কে কি বুঝেছে, জানে না সীমা, কিন্তু ও নিজে বুঝল পায়ের নীচের মাটি সরে যাচ্ছে। চলৎশক্তিহীন হলেও দাদুর উপস্থিতি খানিক নিশ্চিন্দি দিত এদিকের মানুষগুলোকে। এরপর? যোধপুর পার্কের এই বড় ফ্ল্যাটটা নাকি কোম্পানির নামে, আর যে কোম্পানিতে সীমার ভাসুরের তেমন কোন অংশের শেয়ারই নেই, সেখানে তো তাদের থাকারও কোন অধিকার নেই। না, কলকাঠি নেড়ে মন্দিরা নাকি দাদুকে দিয়ে সই করিয়ে আগেই নিজের ভাসুরকে

জিতুর বডি খালাস পেতে অনেক রাত হয়েছিল। নীরজ আর মন্দিরা না থাকলে কে যে করত! সীমা এরপর আর বাড়ি বসে থাকেনি। ব্লিকম আর কম্পিউটারের বেসিক ব্যাপারগুলো জানত, ছোটখাটো একটা চাকরি পেতে অসুবিধে হয়নি। যতক্ষণ অফিসে থাকে, কেটে যায় একরকম। বাড়িতে এলেই, বিশেষ করে চোখের পাতা বন্ধ করলেই, দেখে জিতুর সারা গায়ে আগুন আর ওপর থেকে নিচে পাক খেতে খেতে পড়ছে। আর সারা শরীরে কাঁপুনি শুরু হয়। শাশুড়ি এতেও মন্দিরাকেই দোষী করে।

ডাইরেক্টরশিপ থেকে সরিয়ে ফেলেছিল। প্রতিবাদ করার তো কেউ নেই। অর্থবল, চালাকি আর নীরজের সাহচর্যে মন্দিরা নামমাত্র অর্থমূল্যে সবাইকে বঞ্চিত করে। সীমারা চারজন কসবার এই ঘুপচি ফ্ল্যাট কিনে চলে আসে। একটাই বাঁচোয়া, একমাত্র ননদের বিয়ে আগেই হয়ে গেছিল। মন্দিরা ভাল করেই জানত যে ট্যাঁফো করার কোন লোক এ বাড়িতে নেই। কেউ ভালভাবে কথাই বলতে পারে না তেমন। সীমা ভেতরে ভেতরে ছটফট করত। মন বিদ্রোহ করত, কিন্তু সদ্য বিবাহিতা একুশ বছরের একটি মেয়ে একা কি করবে? এ যেন রাজপ্রাসাদ থেকে কুঁড়েঘরে নিক্ষেপ। জিতু তখন নাচল এক বন্ধুর সঙ্গে কম্পিউটার হার্ডওয়্যারের ব্যবসা করবে বলে। কোন এক মারোয়াড়ি বন্ধুর সঙ্গে। জিতুকে অবশ্য টাকাকড়ি বিশেষ দিতে হবে না। কম্পিউটারে জিতুর খানিক জ্ঞান ছিল, খুটখাট করত বসে। অফিস নিল পার্ক স্ট্রিটে, ভাল জায়গাতেই, একেবারে মিউজিক ওয়ার্ল্ডের ওপরে। মাসদেড়েক পর একদিন দুপুরে সীমা দুপুরের খাবারের থালাটা নিয়ে খাবার টেবিলে বসে টিভিটা চালিয়েছে, প্রথমেই একটা নিউজ চ্যানেল খুলে গেল। সীমার এসব ভাল লাগে না। ওর সিরিয়াল দেখতেই ভাল লাগে। কিন্তু নিউজে কি একটা দেখাচ্ছে, কলকাতার কোথাও প্রচ- আগুন লেগেছে, দাউ দাউ করে জ্বলছে একটা বিল্ডিং। পার্ক স্ট্রিটে। নীচে ফায়ারব্রিগেড, জল দিচ্ছে হোস্পাই পে। কিন্তু লেলিহান আগুন যেন বেড়েই চলেছে। হঠাৎ ওপরের চারতলার জানলার দিক থেকে একজন, পিঠের দিকটা আগুন ধরে গেছে, লম্বাচওড়া বেশ। সীমার কেমন যেন গা শিউরে উঠল দেখে, খেতে খেতে হাত শুকিয়ে গেছে। বার বার দেখাচ্ছে ঐ দৃশ্য, একজন লম্বাচওড়া আ গুন ধরা মানুষ ওপর থেকে পড়ে যাচ্ছে। নীচে স্ক্রল করে এবার কিসব নাম আসতে শুরু করেছে।... জিতেন্দ্র সিং...

– মা... শিগগির এস...

হ্যাঁ, ঐ সময় মন্দিরা এসেছিল। এইসব অ্যাক্সিডেন্টে অনেক ঝামেলা। জিতুর বডি খালাস পেতে অনেক রাত হয়েছিল। নীরজ আর মন্দিরা না থাকলে কে যে করত! সীমা এরপর আর বাড়ি বসে থাকেনি। ব্লিকম আর কম্পিউটারের বেসিক ব্যাপারগুলো জানত, ছোটখাটো একটা চাকরি পেতে অসুবিধে হয়নি। যতক্ষণ অফিসে থাকে, কেটে যায় একরকম। বাড়িতে এলেই, বিশেষ করে চোখের পাতা বন্ধ করলেই, দেখে জিতুর সারা গায়ে আগুন আর ওপর থেকে নিচে পাক খেতে খেতে পড়ছে। আর সারা শরীরে কাঁপুনি শুরু হয়। শাশুড়ি এতেও মন্দিরাকেই দোষী করে। সত্যি কথা বলতে কি, জিতুর তো ওইখানে কাজ করার কথা ছিল না, তার তো হবার ছিল সিং ফিটিংস্এর ডি রেক্টর। সীমাও পারে না সহ্য করতে মন্দিরাকে। ভেতরে ভেতরে সেও জ্বলে হয়তো, তবে শাশুড়ির মত অহর্নিশ বিষোদ্গার করে না।

কাজের বউটি রাত ন'টায় চলে গেল। এই দু'হাজার স্কোয়ার ফিট ফ্ল্যাটটিতে মন্দিরা এবার সম্পূর্ণ একা। না, ভয়ের কোন ব্যাপার নেই। কড়া নিরাপত্তা এই কমপ্লেক্সে। এখনও পর্যন্ত্ম চুব্লিডাকাতির কোন কথা শোনা যায়নি। কাল ফতেহপুর থেকে ফিরে খুব ক্লান্ত লাগছিল, তাই ঘুমিয়ে পড়েছিল। মন্দিরা জানে আজ রাত তার বিনিদ্র কাটবে। কেন? সবই তো পেয়েছে সে। ছোটবেলায় কোন এক সাধু নাকি তাকে দেখে বলেছিলেন 'রাজরানী' হবে। তা রাজরানী তো সে হয়েছে। অতি ছ্ম পোষা ঘরের মেয়ে সে। সেখান থেকে আজ এই বিশাল সম্পত্তির মালিক। একটা কোম্পানির মালিক। উঠত্তেবস তে 'ম্যাডাম, ম্যাডাম', হতে পারে তা অনিচ্ছাকৃত, কিন্তু বলছে তো। আর বেশি গাঁইগুই করলে মন্দিরা সব ব্যাটাকে টার্মিনেট করবে। দুবেজী, রায়বাবু, সবাই, সব্বাইকে। আরে, লোকের অভাব? মাইনে দেবে, দরকার পড়লে নিজের বাপের বাড়ির ওখান থেকে লোক নিয়ে আসবে। ওরা, আশা করা যায় বেইমান হবে না। খুব উথাল্লপাথাল লাগ ছে আজ। অ্যান্টিকুইটি ব্লুর বোতলটা টেবিলে নিয়ে এল। ফ্রিজ খুলে একটা গস্নাসে দুটুক রো বরফ নিয়ে সোফায় বসল। নীরজই শিখিয়েছে এসব।

– আরে ভাবি তুমি এত কাজ কর, এত স্ট্রেস, একটু খাও। ভাল লাগবে।

মাঝেম ধ্যে নিয়ে বসে মন্দিরা। জোরে টিভি চালিয়ে দেয়। এই নৈঃশব্দ্য, নীরবতা যেন সহ্য হয় না। আবার বাপের বাড়িতে সবাই গায়ে গায়ে বসে থাকে, হৈ হৈ করে সেটাও আর ভাল লাগে না। হাঁপিয়ে ওঠে। সারাক্ষণ মনে হয় কলকাতার অফিসে, ফ্যাক্টরিতে কি হচ্ছে। সবাই কি ফাঁকি দিচ্ছে? আমেদাবাদ মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনের টেন্ডারটা যেন লেগে যায়। নাইওরোবিতে যে মালগুলো পাঠানোর কথা, সেগুলো যেন সময়মত ডেলিভারি হয়। তাহলে এক লাফে এবার টার্ন্ওভার অনেকটা বেড়ে যাবে। কোয়ালিট্রিক ন্ট্রোল নিয়ে দুবেজী, তিওয়ারিজী, এরা বড্ড মাথা ঘামায়, মন্দিরা এসব ভাবে না। আরে, এত টাকা দিয়ে আইএসও ৯০০১ তো হয়েইছে, আবার কিসের কোয়ালিটি? দূর! আর ভাবতে ভাল লাগে না। টিভি বন্ধ করে পরের পেগ ঢালে গ্লাসে। বাবুয়াকে ফোন করবে একবার। বাবুয়াকে ফোন করার আগে বেশ খানিকটা মানসিক প্রস্তুতি লাগে মন্দিরার। করছি করব, করছি করব হয়। নাম্বার নিয়ে নাড়াচাড়া করে কয়েকবার, তারপর ডায়াল করে। এতক্ষণে নিশ্চয়ই টিউশন থেকে ফিরেছে। মিসড্কল দেখে তো আবার কখনোই রিঙ্ব্যাক করবার ছেলে নয় ও।

– হ্যালো

– হুম

– কিরে ফিরেছিস টিউশন থেকে?

– হুম

– এসে খেয়েছিস? ডিনারে আজ মামি কি বানিয়েছে?

– যা বলার বল... আমার কাজ আছে

– বাবুয়া তুই আমার সাথে এমন করিস কেন বল তো?

– (চুপ করে থাকে বাবুয়া)

– তোর জন্য আমি তিন মাস ছাড়া ছাড়া মামাবাড়ি যাই, তুই একটা কথাও বলিস না আমার সাথে।

– আমি তোমায় আসতে বলেছি?

– কেন তুই এরকম করিস? তোর জন্যেই তো সব...

– এইসব সেন্টি কথা বোলো না। যা বলার জন্যে ফোন করেছ সেটা বল, আমার পড়া আছে।

– বাবুয়া তুই ঠিক করে পড়াশুনো কর, এমবিএ কর তারপর এখানে এসে কোম্পানির চাবি নে, কোম্পানিকে আরো বড়ো কর...

– কে? আমি? পাগল? দুস্স...

– মানে? তুই না তো কে?

– কেন তোমার ঐ নীরজ তো আছে।

– তোমার ঐ নীরজ কি রে? চাচা বল...

রায়বাবু মন্দিরার চেম্বার থেকে বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে সারা অফিসে যে খবরটা রাষ্ট্র হয়ে গেল সেটা মন্দিরা সিসিটিভি দেখেই আন্দাজ করতে পারল। এক এক করে টেবিলের ইন্টারকম বাজতে শুরু করে। বারকয়েক ভেতর থেকে নীরজের নামটাও যেন শোনে মন্দিরা। আজ সকাল থেকে জিতুর কথা খুব মনে পড়ছে মন্দিরার। মন্দিরা যখন বিয়ে করে প্রথম আসে এখানে, তখন চাচ্চীচাচী ব লে খুব গায়ের সঙ্গে লেপটে থাকত জিতু।

– চাচ্চা!! শালা... আর শোন তোমার কলকাত্তায় আমি কোনদিন যাব না।

– কি বলছিস তুই বাবুয়া?

– যা বলছি শুনে রাখো...। কলকাত্তা যাবে কোন শালা? ঐ সব শুনতে যাব? তোর বাপ কে? নীরজ তোর কে? এইসব শুনতে শুনতে আমি পাগল হয়ে গেছি জান? তুমি মস্তি কর আমায় ঘাঁটাতে এস না...

বলে খচ করে বাবুয়া মোবাইল অফ করে দিল। একেবার স্তম্ভিত হয়ে গেল মন্দিরা। একি বলছে বাবুয়া? ও কোনদিনও এখানে আসবে না? তাহলে কার জন্যে এসব? ঠাকুরঘরে ছুটে যায় মন্দিরা। কৃষ্ণের বড় সাদা ধবধবে বিগ্রহ সামনে। শ্বশুরবাড়ির। অনেক পুরনো। সকালে মালা দিয়েছে। বসে পড়ে সামনে মন্দিরা। বলতে চায় অনেক কিছু। কিন্তু কোন কথা সরে না মুখ দিয়ে। ঠাকুরের মুখের দিকেও তাকিয়ে থাকতে পারে না, লুটিয়ে পড়ে পায়ের কাছে। কান্নার দমকে সারা শরীর কাঁপতে থাকে।

ভোর রাতের দিকে খানিক চোখ লেগে গিয়েছিল মন্দিরার। ঠাকুরঘর থেকে কখন শোবার ঘরে এসেছে, বিছানায় শুয়েছে কিছুই খেয়াল নেই। সাতটা নাগাদ ঘুম ভাঙল। বাথরুম থেকে ঘুরে এসে কাজের বউটির অপেক্ষা না করে নিজেই এক কাপ কফি বানিয়ে বসল মোবাইলটা নিয়ে। চার্টার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্টকে ফোন করল, বলল আজ দুপুরের মধ্যেই কোম্পান্নি সেক্রেটারিকে খবর দিতে, আসার জন্যে। তারপর নিজেই ফোন করল কোম্পানির লিগ্যাল অ্যাডভাইজারকে। না, মন্দিরা তো কিছুই ঝোঁকের বশে করছে না। বরং এখন সেই কালকের মানসিক যন্ত্রণা, শারীরিক অস্থিরতা কিছুই নেই। বেশ শান্ত মন। কাজের বউকে বলল খুব ভাল করে সারা বাড়ি ভাল করে ঝাড়পোঁছ করতে। স্নান করে ঠাকুরের আসন পরিষ্কার করল। বসে থাকল খানিক ঠাকুরের সামনে চেয়ে। ভাল করে ব্রেকফাস্ট করে যখন গাড়িতে গিয়ে উঠছে, তখন বাজে ঠিক বারোটা বেজে পনেরো। অফিসে পৌঁছে আজ সবাইকে খুব মন দিয়ে কাজ করতে দেখল মন্দিরা। ভেতরে ঢুকে বাবুজীর ছবিতে নিজের অজান্তেই চোখ পড়ে গেল। আজ বসার আগে একটা নমস্কার করল কি জানি কেন, খুব ইচ্ছে হল মন্দিরার। তারপর বসল চেয়ারে। রায়বাবু সঙ্গে সঙ্গে ঢুকলেন চেম্বারে। অনেক পুরনো লোক, বাবুজীর সঙ্গে ছিলেন প্রথম থেকেই।

– রায়বাবু আপনি সব ডকুমেন্ট রেডি করান আজই নতুন ডিরেক্টরের পদের জন্য।

– কার নামে হবে মন্দিরা?

– রায়বাবু স্ট্যাম্পটা আমিই তৈরি করিয়ে নেব, আপনি নতুন ডিরেক্টর অ্যাপয়েন্ট করানোর সব ফর্ম রেডি করান।

– আচ্ছা।

রায়বাবু মন্দিরার চেম্বার থেকে বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে সারা অফিসে যে খবরটা রাষ্ট্র হয়ে গেল সেটা মন্দিরা সিসিটিভি দেখেই আন্দাজ করতে পারল। এক এক করে টেবিলের ইন্টারকম বাজতে শুরু করে। বারকয়েক ভেতর থেকে নীরজের নামটাও যেন শোনে মন্দিরা। আজ সকাল থেকে জিতুর কথা খুব মনে পড়ছে মন্দিরার। মন্দিরা যখন বিয়ে করে প্রথম আসে এখানে, তখন চাচ্চীচাচী ব লে খুব গায়ের সঙ্গে লেপটে থাকত জিতু। আজ যদি পাশে থাকত ছেলেটা! আবার বাবুজীর ছবিতে চোখ চলে গেল, চোখের কোণ কি খানিক ভিজে উঠল? মন্দিরার ইনোভায় রায়বাবুকে নিয়েছে। একজন কোম্পান্নি সেক্রেটারি আর উকিল যাচ্ছেন অন্য গাড়িতে। গাড়ি ধর্মতলার দিকে ঘুরতেই রায়বাবু বলে ওঠেন–

– এ কি ফ্যাক্টরি যাবে না? হাওড়ার দিকে ঘুরলে না শম্ভু?

– না হাওড়ায় কে থাকে?

– মানে নী...

– না, রায়বাবু হাওড়া যাচ্ছি না ।

মন্দিরার মুখে বিরক্তির ছাপ দেখে রায়বাবু আর কোন প্রশ্ন করতে সাহস পান না। পরপর দুটো গাড়ি এই সরু গলিতে ঢুকতে অসুবিধেই হয়। লিফট নেই ফ্ল্যাটে, দোতলায় উঠতে বেশ বেগ পেতে হয় সকলকে। বেল বাজানোর সঙ্গে সঙ্গে সীমা দরজা খোলে। মুখ রাগে টকটকে লাল।

– তোমার ব্যাপারটা কি বল তো? অফিস থেকে আমায় হন্তদন্ত হয়ে ফিরে আসতে হল।

ভেতর থেকে নিজের জাকেও বেরিয়ে আসতে দেখে মন্দিরা। এ কি চেহারা হয়েছে দিদিভাইয়ের! খ্যাড়খ্যাড়ে গলায় মায়া বলে ওঠে–

– আরো কি ছিনিয়ে নিতে এসেছিস তুই মন্দিরা? আর কি আছে আমাদের এই দুই বিধবার?

তারপরেই ঘরে তিনজন লোককে ঢুকতে দেখে থতমত খেয়ে চুপ করে গেল মায়া।

– সীমা এঁরা কিছু কাগজ এনেছেন তুই পড়ে সাইন করে দে।

– আর কি কি নেবে তুমি আমাদের কাকিমা? সত্যিই তো আর কিছু নেই আমাদের।

– শোন সীমা, তুই সিং ফিটিংস প্রাইভেট লিমিটেডে জয়েন করছিস। তোকে আমি ওখানকার ডিরেক্টর বানাচ্ছি। এখনই ৫০ভাগ শেয়ার ট্রান্সফার করার কিছু লিগ্যাল অসুবিধে আছে, কিন্তু ঠিক অর্ধেক ভাগ তুই পাবি সে ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকতে পারিস। রায়বাবু... আপনারা তাহলে আপনাদের কাজ করে আবার অফিস রওনা হোন, আমার বাড়িতে কিছু কাজ আছে আমি আর আজ অফিস যাব না।

একগাদা কাগজে ভরা একটা ফাইল সীমাকে সই করিয়ে, তার এক কপি সীমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে তিনজনই আবার নীচে নামতে শুরন্ন করেন। মন্দিরা সোফায় বসে, সীমা আর মায়া দাঁড়িয়ে।

– সীমা এক গ্লাস জল দিবি?

সীমা জল আনতে ভেতরে যেতেই মন্দিরা মায়ার কাছে এসে দাঁড়ায়।

– দিদিভাই আমি পারছি না, তোমরা বাড়ি চল...

– এটা আবার কি নাটক?

– হ্যাঁ নাটক যাত্রা যাই বল তোমরা এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে যোধপুর পার্ক যাচ্ছ। আর তোমাদের জিনিসপত্র কাল আমি লোক দিয়ে ওবাড়ি আনিয়ে নেব।

– মানে?

– দিদিভাই জান তো, আমি যা চাই তাই করি, তোমরা আমার সঙ্গে যাচ্ছ ব্যাস। আর সীমা কাল থেকেই তুমি আমার সঙ্গে সিং ফিটিংস্নএর অফিস যাবে। সব কাজকর্ম বুঝে নেবে।

সীমা আর মায়া তখনও ধাতস্থ হয়নি। সব কিছু যেন সিনেমার মত। মন্দিরার ইনোভায় তিনজন যখন যোধপুর পার্কের ফ্ল্যাটের গেটে তখন বিকেল গড়িয়ে যেতে যেতে যেন থমকে দাঁড়িয়ে আছে কিছুক্ষণ। দু'দিন বৃষ্টিও নেই। আকাশ বেশ পরিষ্কার। কতদিন পর আকাশের এই নীল রঙ দেখল মন্দিরা।

সুদেষ্ণা দাশগুপ্ত
ভারতের ছোটগল্পকার

দর্শন

বৌদ্ধ ধর্ম ও বিজ্ঞান

এস এস চাকমা

পৃথিবীতে মানব সভ্যতার উন্মেষের সময় থেকে ধর্মেরও সৃষ্টি হয়েছে। তবে তখন মানুষ ছিল হয় প্রকৃতির উপাসক, নয় নানা দেব-দেবীর পূজারী। তখন তারা বিশ্বাস করত কোন অলৌকিক শক্তি অথবা কোন দেবতা বা দেবীই তাদের সৃষ্টি করেছে, পৃথিবীকেও সৃষ্টি করেছে। তারা আরো বিশ্বাস করত সেই অলৌকিক শক্তি অথবা দেব-দেবীই তাদের ভাগ্য নিয়ন্তা– তারা তাদের ভালও করতে পারে; রোগ-ব্যাধি থেকেও তারাই তাদের মুক্ত করতে পারে। তাই তারা তাদের দেব-দেবীদের নামে মন্দির বানাত এবং সে-সব মন্দিরে গিয়ে পূজা-অর্চনা করত। এমনকি অনেক জাতি-উপজাতি তাদের দেবতাদের সন্তুষ্টির জন্য পশু, এমনকি নরবলিও দিত। এমনকি কয়েকশো বছর আগেও বর্তমান অসমের কামাখ্যা মন্দিরে নরবলি হত।

আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৫০০০ অব্দে পৃথিবীতে মানবসভ্যতার প্রথম উন্মেষ ঘটে মধ্যপ্রাচ্যের সুমেরন্নতে (বর্তমান ইরাক)। তখন সুমাররা তাদের প্রধান শহর 'উর' নগরে তাদের চন্দ্র দেবতা 'নান্না'র নামে মন্দির তৈরি করেছিল। একইভাবে প্রাচীন ব্যাবিলনীয়রা আনুমানিক ৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে প্রাচীন ব্যাবিলন নগরে তাদের প্রধান দেবতা 'মারদুক'-এর নামে একটি বিরাট মন্দির নির্মাণ করেছিল।

একইভাবে প্রাচীন গ্রিক এবং রোমানরাও নানা দেব-দেবীতে বিশ্বাসী ছিল এবং তারা এসব দেবতা ও দেবীদের পূজা করত। গ্রিকদের দেব-দেবীদের একজন রাজা ছিল। রাজার নাম ছিল 'জিউস'। 'জিউস'-এর সম্মানে তারা অলিম্পিয়া নামক স্থানে খ্রিস্টপূর্ব ৭৭৬ অব্দে প্রতি ৪ বছর অন্তর খেলাধূলার আয়োজন করত। সেজন্য সে খেলাধূলার নাম হয় 'অলিম্পিক গেমস'। গ্রিসের সকল রাজ্য হতে ক্রীড়াবিদেরা সেই খেলাধূলায় অংশগ্রহণ করতেন। সেই প্রাচীন 'অলিম্পিক গেমস'কে অনুসরণ করে ১৮৯৪ সালে আধুনিক অলিম্পিক গেমস শুরন্ন করা হয়। তাদের সৌন্দর্যের রানীর নাম ছিল 'ভেনাস'।

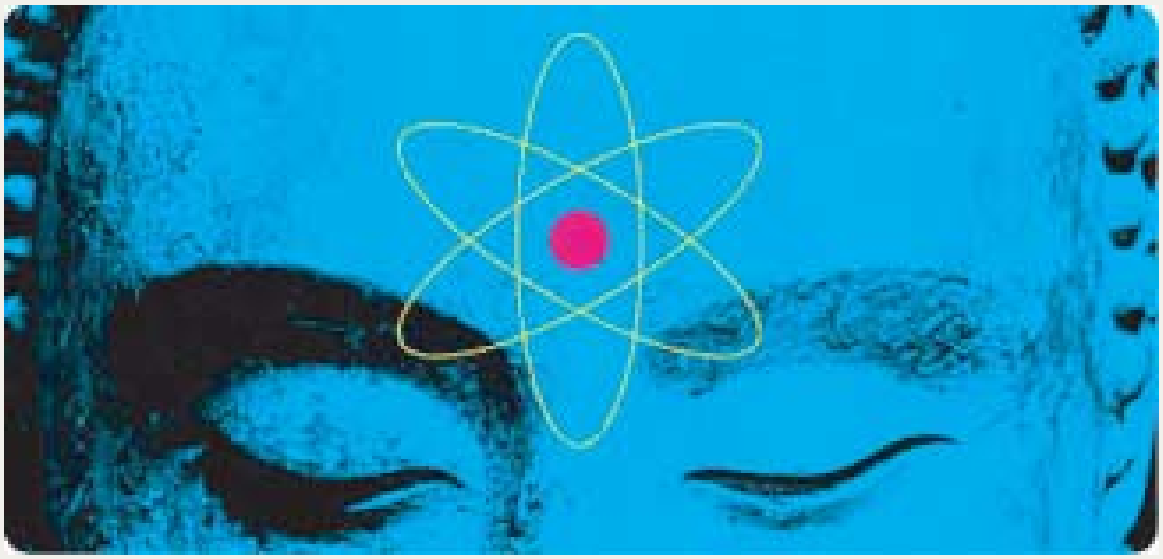

একইভাবে প্রাচীন রোমানরাও অনেক দেব-দেবীর পূজা করত। রোমানদের দেব-দেবীদেরও একজন রাজা ছিল। তার নাম ছিল 'জুপিটার'। ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পূর্বে বর্তমান ইরানের (তখন নাম ছিল পারস্য) অধিবাসী পারসিকরা অগ্নি পূজা করত আর ভারতের আর্যরা চন্দ্র, সূর্য এবং অগ্নির উপাসনা করত। পরবর্তীকালে তারা অনার্যদের সঙ্গে মিশে হিন্দু হয়ে নানা দেব-দেবীর পূজা করত। সে সব দেব-দেবীরও একজন রাজা ছিল। তার নাম ছিল ইন্দ্র।

এভাবে দেশে দেশে প্রত্যেক জাতিউপজাতিরা নানা দেব-দেবীর আরাধনা করত। তারা সবাই মনে করত তাদের দেব-দেবীরাই তাদের মঙ্গলঅম ঙ্গলের নিয়ামক এবং তাদের যাবতীয় রোগ ব্যাধির আরোগ্যদাতা। সেজন্য অনেক জাতিউপজাতি দেবতা এবং দেবীদের ভোগের জন্য পশুবলিও দিত।

ইহুদিরাই প্রথম একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী হয়। তাঁদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ আদি পুস্তক বা ওল্ড টেস্টামেন্টে জগৎ এবং মানব সৃষ্টির ইতিহাস সংক্ষেপে নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করা হয়েছে:

'আদিতে ঈশ্বর আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন। তখন পৃথিবী শূন্য ও ঘোর অন্ধকার জলধির উপরে ছিল এবং ঈশ্বরের আত্মা জলের উপর অবস্থান করছিলেন।

'পরে ঈশ্বর কহিলেন, দীপ্তি হউক, তাহাতে দীপ্তি হইল। তখন ঈশ্বর দীপ্তি উত্তম দেখিলেন এবং ঈশ্বর অন্ধকার হতে দীপ্তি পৃথক করিলেন। আর ঈশ্বর দীপ্তির নাম দিবস এবং অন্ধকারের নাম রাত্রি রাখিলেন। আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে প্রথম দিবস হইল।

'পরে ঈশ্বর কহিলেন, জলের মধ্যে বিতান হউক এবং জলকে দুইভাগে পৃথক করন্নক। তাহাতে সেইরূপ হইল। পরে ঈশ্বর বিতানের নাম আকাশম-ল রাখিলেন। আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে দ্বিতীয় দিবস হইল।

'পরে ঈশ্বর কহিলেন, আকাশম-লের নীচস্থ সমস্ত্ম জল একস্থানে সংগৃহীত হউক এবং স্থল সপ্রকাশ হউক। তাহাতে সেইরূপ হইল। তখন ঈশ্বর স্থলের নাম ভূমি এবং জলরাশির নাম সমুদ্র রাখিলেন। পরে ঈশ্বর কহিলেন, ভূমি, তৃণ, বীজ উৎপাদক ঔষধি ও সবীজ স্ব স্ব জাতি অনুযায়ী ফলের উৎপাদক ফলবৃক্ষ, ভূমির উপরে উৎপন্ন করন্নক, তাহাতে সেইরূপ হইল, আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে তৃতীয় দিবস হইল।

'পরে ঈশ্বর কহিলেন, রাত্রি হইতে দিবসকে ভিন্ন করা হউক। আকাশমণ্ডলের বিতানে জ্যোতিগণ হউক, সে সমস্ত চিহ্নের জন্যে, ঋতুর জন্য এবং দিবসের ও বৎসরের জন্য হউক এবং পৃথিবীতে দীপ্তি দিবার জন্য দীপ বলিয়া আকাশমণ্ডলের বিতানে থাকুক, তাহাতেও সেইরূপ হইল। ফলত ঈশ্বর দিনের উপরে কর্তৃত্ব করিতে এক মহাজ্যোতিঃ এবং রাত্রির উপর কর্তৃত্ব করিতে তদপেক্ষা একটি ক্ষুদ্র এক জ্যোতিঃ এবং নক্ষত্রসমূহ নির্মাণ করিলেন। আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে চতুর্থ দিবস হইল।

'পরে ঈশ্বর কহিলেন, জল নানা জাতীয় জঙ্গম প্রাণিবর্গে প্রাণিময় হউক এবং ভূমির উর্ধ্বে আকাশমণ্ডলের বিতানে পক্ষিগণ উড়ুক। সেই রকমই হইল। আর ঈশ্বর সে সকলকে আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন, তোমরা প্রজাবন্ত ও বহু বংশ হও, সমুদ্রের জল পরিপূর্ণ কর এবং পৃথিবীতে বাহুল্য হউক, আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে পঞ্চম দিবস হইল।

'পরে ঈশ্বর কহিলেন, ভূমি নানা জাতীয় প্রাণিবর্গ অর্থাৎ স্ব স্ব জাতি অনুযায়ী গ্রাম্য পশু, সরীসৃপ ও বন্য পশু উৎপন্ন হউক, তাহাতে সেইরূপ হইল। পরে ঈশ্বর কহিলেন, আমরা আমাদের প্রতিমূর্তিতে, আমাদের সাদৃশ্যে মনুষ্য নির্মাণ করি। আর তাহারা সমুদ্রের মৎস্যদের উপরে, আকাশের পক্ষীদের উপরে, পশুগণের উপরে, সমস্ত পৃথিবীর উপরে ও ভূমিতে গমনশীল যাবতীয় সরীসৃপের উপরে কর্তৃত্ব করুক। পরে ঈশ্বর আপনার প্রতিমূর্তিতে মনুষ্যকে সৃষ্টি করিলেন, ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতেই তাহাকে সৃষ্টি করিলেন, পুরুষ ও স্ত্রী করিয়া তাহাদিগকে সৃষ্টি করিলেন। পরে ঈশ্বর তাহাদিগকে আশীর্বাদ করিলেন এবং কহিলেন, তোমরা প্রজাবন্ত ও বহু বংশ হও এবং পৃথিবী পরিপূর্ণ ও বশীভূত কর। আর সমুদ্রের মৎসগণের উপরে আকাশের পক্ষীগণের উপরে এবং ভূমিতে গমনশীল যাবতীয় জীবজন্তুর উপর কর্তৃত্ব কর। তাহাতে সেইরূপ হইল। আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে ষষ্ঠ দিবস হইল।

'এইরূপ আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী এবং তদুভয়াস্থ সমস্ত বস্তুব্যূহ সমাপ্ত হইল।

'পরে ঈশ্বর সপ্তম দিনে আপনার কৃত সমস্ত কার্য হইতে নিবৃত্ত হইলেন, বিশ্রাম করিলেন, আর সপ্তম দিনকে আশীর্বাদ করিয়া পবিত্র করিলেন।

'আর ঈশ্বর মৃত্তিকার ধূলিতে আদমকে অর্থাৎ মনুষ্যকে নির্মাণ করিলেন এবং তার নাসিকায় ফুঁ দিয়ে প্রাণবায়ু প্রবেশ করাইলেন। তাহাতে মানুষ সজীব প্রাণী হইল। এরপর ঈশ্বর আদমকে ঘোর নিদ্রায় মগ্ন করিয়া তাহার একখান পঞ্জর লইয়া সেটা হইতে এক স্ত্রী নির্মাণ করিলেন।'

ইহুদীদের আদি পুস্তক বা ওল্ড টেস্টামেন্টের বর্ণনা মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য ধর্মগ্রন্থেও উলেখ রয়েছে এবং সে সব ধর্মাবলম্বীরাও এই বর্ণনা বিশ্বাস করে থাকে। এসব বাণীকে ঈশ্বরের বাণীও বলা হয়। আর এসব বাণীকে অস্বীকার করা কেবল পাপ নয়, শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়। আরো দাবি করা হয় এসব অস্বীকার করার অর্থ হল ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

কিন্তু সপ্তদশ শতকে পাশ্চাত্যে বৈজ্ঞানিক বিপব শুরু হলে এসব বিশ্বাসের উপর চরম ধাক্কা আসে। তখন ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে প্রচ-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। কারণ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও দৃষ্টিভঙ্গি ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত ব্যাখ্যার পরিপন্থী।

১৫৪৩ খ্রিস্টাব্দে কোপারনিকাস আবিষ্কার করেন যে পৃথিবী স্থির নয় বরং সূর্যের চারদিকে ঘোরে। কোপারনিকাসের এই আবিষ্কার তৎকালীন পৃথিবীতে এক বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করে। এরপর ১৬১০ খ্রিস্টাব্দে গ্যালিলিও জুপিটারেরও যে নিজস্ব চন্দ্র আছে সেটা আবিষ্কার করেন।

তাঁর এই আবিষ্কার প্রচার করতে গিয়ে তিনি মহাবিপদে পড়েন। শেষপর্যন্ত ধর্মীয় বিচারালয়ে এই মতবাদ প্রত্যাহার এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে তিনি নিজের প্রাণ রক্ষা করেন।

এরপর ডারউইনএর বিবর্তনবাদ ধর্ম বিশ্বাসীদের বিশ্বাসে চরম আঘাত হানে। ডারউইনের 'দি অরিজিন অফ স্পেসিস বাই মিন্‌স অফ ন্যাচারাল সিলেকশন' গ্রন্থটি ১৮৫১ সালে প্রকাশিত হয়। বইটির মতবাদ আদি গ্রন্থ বা ওল্ড টেস্টামেন্ট তথা পবিত্র বাইবেলে বর্ণিত পৃথিবী মানবজাতি এবং অন্যান্য প্রাণীজগতের সৃষ্টির মতবাদকে একেবারে অস্বীকার করে। সে সঙ্গে ধর্মবিশ্বাসের মূলে চরম কুঠারাঘাত করে।

বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে মূল পার্থক্য হল এই, ধর্ম অন্ধ বিশ্বাস– এখানে মুক্তি ও বিশেষণের কোন স্থান নেই; পরীক্ষানিরী ক্ষারও কোন স্থান নেই। অন্যদিকে বিজ্ঞানে বিশ্বাসের কোন স্থান নেই; পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা হল এর ভিত্তি।

বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের দ্বন্দ্ব বৌদ্ধ ধর্মে একেবারেই নেই। বৌদ্ধ ধর্মকে বিশেষণ করলে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের নজরে আসে। বৌদ্ধদের ধর্মগ্রন্থ 'ত্রিপিটক' কোন ঈশ্বরের বাণী নয়। গৌতম বুদ্ধ তাঁর বাণীগুলো ঈশ্বর বা কোন ঐশ্বরিক শক্তির কাছ থেকে পাননি। তাঁর বাণীগুলো তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফল। তাঁর বাণী বা নীতি বা মতবাদ যেন কেউ অন্ধভাবে গ্রহণ না করে সে ব্যাপারেও তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই তাঁর প্রচারিত ধর্ম অর্থাৎ বৌদ্ধ ধর্মকে জানতে এবং বিশ্বাস করতে বলেছেন বিশ্বাসের মাধ্যমে নয় বরং বিচার বিশেষণ ও পরীক্ষার মাধ্যমে।

গৌতম বুদ্ধ তাঁর অনুসারীরা যেন তাঁর কথাগুলো নির্বিচারে গ্রহণ না করে সে বিষয়ে সতর্ক ছিলেন। 'অঙ্গুত্তর নিকায়'এ তিনি যা বলেছেন তা এখানে খুবই প্রণিধানযোগ্য। তিনি তাঁর শিষ্যদের বলেছেন:

১. শুধু জনশ্রুতির ভিত্তিতে কোন কিছুকেই বিশ্বাস কোরো না।
২. কোন একটি ঐতিহ্যকে শুধু প্রাচীন হবার কারণে এবং বংশ পরম্পরায় প্রচলিত হয়ে আসছে বলে বিশ্বাস কোরো না।
৩. লোকে খুব বেশি বলাবলি করে বলেই কোন কিছুকেই বিশ্বাস কোরো না।
৪. শুধু প্রাচীন কোন বিজ্ঞলোকের লিখিত প্রমাণ হিসেবে প্রদর্শিত হয়েছে বলেই কোন কিছুকে বিশ্বাস কোরো না।
৫. যাকে স্বীকার করে নিতে হবে বা যাকে সত্য বলে গ্রহণ করতে কোন প্রাচীন দৃষ্টান্ত তোমাকে প্রলুব্ধ করতে পারে সে ধরনের কোন জিনিসকে কখনও বিশ্বাস করবে না।
৬. শুধু তোমার গুরুর অথবা পুরোহিতের প্রত্যাদেশ বলেই কোন কিছুকেই বিশ্বাস করবে না।
৭. তুমি কেবল সেটিকেই সত্য বলে এবং তোমার জীবনের পথ প্রদর্শক হিসেবে গ্রহণ করবে যা নিখুঁতভাবে অনুসন্ধানের পর তোমার যুক্তি ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলবে এবং যা তোমার নিজের এবং প্রাণীর মঙ্গলের জন্য সহায়ক হবে।

উপরোলেস্নখিত কথাগুলো একজন ধর্ম প্রচারকের সন্দেহ নেই কিন্তু এর মধ্যে যে স্বাধীন ও বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটেছে তা নিঃসন্দেহে বৈজ্ঞানিক।

এখানে উলেখ্য যে, বৌদ্ধ ধর্মে অলৌকিক ধারণার, নির্বিচারবাদ বা অন্ধ বিশ্বাসের কোন স্থান নেই। বৌদ্ধধর্ম কোন ঈশ্বর বা ঈশ্বরের বাণী, কোন প্রাধিকার বা ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল নয়। এর ভিত্তি হল নীতি বা মতবাদ। বুদ্ধ এই নীতি বা মতবাদকে যেন কেউ অন্ধভাবে গ্রহণ না করে বা বিশ্বাস না করে সে ব্যাপারেও গুরুত্ব দিয়েছেন এবং তাঁর শিষ্যদের বলেছেন তার বাণীগুলো যেন তাঁরা সরলভাবে গ্রহণ না করে যাচাই করে গ্রহণ করে এবং বাণীগুলো সঠিক বলে প্রমাণিত হলে সেগুলো গ্রহণ করে।

আরো উলেখ্য যে, বৌদ্ধ ধর্মে মানুষের মুক্তির জন্য ঈশ্বর বা অতি জাগতিক শক্তির কোন ভূমিকা নেই। দেব-দেবীদেরও কোন স্থান নেই। নরকের ভয় বা স্বর্গেরও কোন প্রলোভন নেই। কোন কুসংস্কার বা অন্ধ বিশ্বাসেরও সুযোগ নেই। বুদ্ধের আবিষ্কৃত সত্য বিশ্বাসের মাধ্যমে বোঝা সম্ভব নয়, বুঝতে হবে যুক্তির মাধ্যমে, বিশেষণের মাধ্যমে, পরীক্ষার মাধ্যমে। বৌদ্ধ ধর্ম হচ্ছে স্বাবলম্বনের ধর্ম। বুদ্ধের মতে মানুষের মুক্তিদাতা মানুষ নিজেই। প্রতিটি মানুষকে নিজের মুক্তির জন্য, মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করতে হবে। মানুষই মানুষের ভাগ্যবিধাতা বৌদ্ধ ধর্মের একটি বড় শিক্ষা। কোন অলৌকিক শক্তি বা অদৃষ্টের উপর ভরসা করে নিষ্কর্মা হয়ে বসে থাকা বৌদ্ধ ধর্মমতে একেবারে নিষ্ফল এবং অর্থহীন। বৌদ্ধ ধর্ম একটি প্রাচীন ধর্ম, ২৫৫০ বছরের অধিক আগে গৌতম বুদ্ধ এটি প্রচার করে গেছেন। কিন্তু এটি একটি আধুনিক ধর্ম, যার সঙ্গে বিজ্ঞানের কোন বিবাদ নেই।

এস এস চাকমা সাবেক রাষ্ট্রদূত

সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

নতুন গ্রাহক অন্তর্ভুক্তি প্রসঙ্গে

আপনাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ইতোমধ্যে *ভারত বিচিত্রা*র অনলাইন এডিশনের সুবিধা চালু হয়ে গেছে এবং আপনারা অনলাইনে *ভারত বিচিত্রা* পড়ার সুযোগ পাচ্ছেন। এছাড়াও ফেসবুকে সংযুক্ত হতে পারেন। এই মুহূর্তে পত্রিকাটির নতুন গ্রাহকদের নামঠিকানা অ ন্তর্ভুক্তির কাজ চলছে। *ভারত বিচিত্রা*র পুরনো ও নতুন গ্রাহকপাঠক দের অনেকেরই টেলিফোন/ মোবাইল নম্বর/ ই-মেইল আইডি আমাদের কাছে নেই। যাঁরা নিয়মিত *ভারত বিচিত্রা* পড়তে ইচ্ছুক, এ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর অবিলম্বে নতুন গ্রাহক হিসেবে তালিকাভুক্ত হতে নাম, পদমর্যাদা (যদি থাকে), পূর্ণ ঠিকানা, টেলিফোন/ মোবাইল নম্বর, ই-মেইল আইডি (যদি থাকে) উলেখ করে সম্পাদক বরাবর চিঠি লিখে পাঠান। সবাইকে *ভারত বিচিত্রা*র সঙ্গে সব সময় সংযুক্ত রাখার উদ্দেশ্যেই সংশোধিত নতুন তালিকা প্রস্তুতির এ আয়োজন।

*ভারত বিচিত্রা*র পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধি, এর প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ এবং একে আরও প্রাঞ্জল রূপ দেওয়াই আমাদের লক্ষ্য। আপনাদের প্রিয় পত্রিকায় ভ্রমণকাহিনি, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, গল্প, কবিতা, উপন্যাস প্রভৃতি লিখে পাঠাতে পারেন। লেখার কপি রেখে এবং ঠিকানা নির্ভুলভাবে লিখে পাঠাবেন। লেখা পাঠানোর ৬ মাসের মধ্যে মুদ্রিত না হলে বুঝতে হবে লেখা অমনোনীত হয়েছে। এ ব্যাপারে যে কোন ধরনের যোগাযোগ লেখকের অযোগ্যতা বলে বিবেচিত হবে।

– সম্পাদক

নিবন্ধ

মহাকাশে ভারতের অ্যাস্ট্রোস্যাট

ড. নিশীথকুমার পাল

আস্ট্রোস্যাট। ভারতের কৃত্রিম উপগ্রহ। অ্যাস্ট্রো ও স্যাটেলাইট (উপগ্রহ) শব্দ দুটি জুড়ে নামকরণ। সময় ২০১৫ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর সোমবার সকাল ১০টা। স্থান অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটার সতীশ ধবন মহাকাশ কেন্দ্র। পাঁচ, চার, তিন, দুই, এক...। গুণতির রেশ মিলিয়ে যাওয়ার আগেই আগুনের শিখা ছড়িয়ে রকেট উড়ল আকাশ ফুঁড়ে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে পুলিকট হ্রদ লাগায়ো শ্রীহরিকোটার সতীশ ধবন মহাকাশ কেন্দ্র জুড়ে বোঝা গেল তার প্রতিক্রিয়া– গুমগুমগুম শব্দে। উৎক্ষেপণস্থলের সাত কিলোমিটারে দূরে মিডিয়া সেন্টারও রেহাই পেল না। মাটিতে ধাক্কা দিয়ে রকেটের উর্ধ্বগমনের পাল্টা অভিঘাতে থরথর করে কেঁপে উঠল চারতলা বাড়িটা।

কাঁটায় কাঁটায় সকাল দশটায় পিএসএলভি স্লি৩০ র কেটে সওয়ার হয়ে মহাকাশে পাড়ি দিল অ্যাস্ট্রোস্যাট। ভারতের নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি কৃত্রিম উপগ্রহ। ব্ল্যাকহোল বা কৃষ্ণ গহ্বরসহ ব্রহ্মাণ্ড-র বিবিধ রহস্য সন্ধানের ভার বর্তেছে দেড় হাজার কিলোগ্রামের উপগ্রহটির ওপরে। আগামী পাঁচ বছর ধরে সে ক্ষণিকের জন্যেও দায়িত্ব সম্পাদনে বিরতি দেবে না। অর্থাৎ কিনা মহাকাশে ভারতের পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে কাজ করবে অ্যাস্ট্রোস্যাট।

এদিন অ্যাস্ট্রোস্রাটের সঙ্গে একই রকেটে চাপিয়ে আমেরিকার একটি সংস্থার চারটি উপগ্রহ এবং কানাডা ও ইন্দোনেশিয়ার একটি করে উপগ্রহ মহাকাশে পৌঁছে দিয়েছে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরো। উপগ্রহগুলির সব ক'টি ছোট মাপের। সব মিলিয়ে ওজন ১১৮ কিলোগ্রাম। প্রসঙ্গত, এই প্রথম কোনও মার্কিন সংস্থা তাদের উপগ্রহ ইসরোর মাধ্যমে মহাকাশে পাঠাল। বিদেশি এই উপগ্রহগুলির রিমোট সেন্সিং, জিপিএস পরিষেবা এবং অটোমেটিক আইডেনটিফিকেশন সিস্টেম পরিষেবা সমুদ্রে নজরদারির কাজে লাগানো হবে।

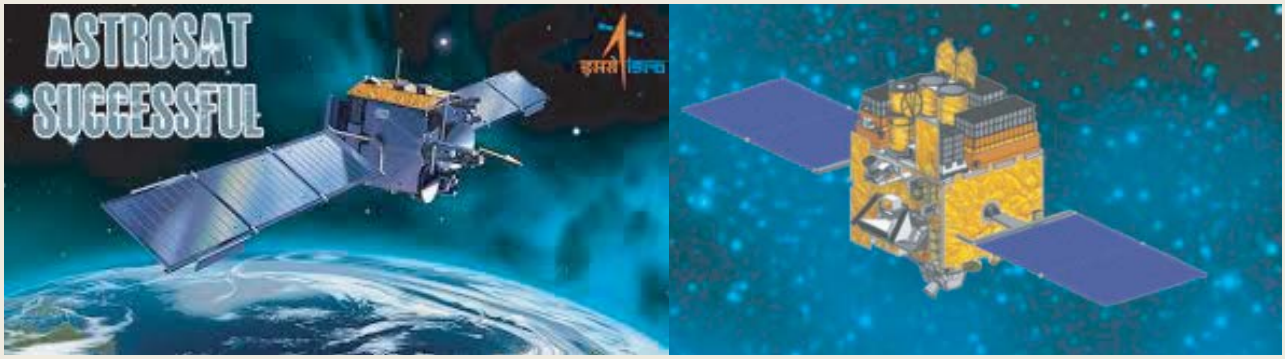

ইসরোর দায়িত্ব ছিল বিদেশি এই উপগ্রহগুলিকে নির্দিষ্ট কক্ষপথে পৌঁছে দেওয়া। সে কাজ সফলভাবেই শেষ হয়েছে বলে জানিয়েছেন ইসরোর কর্মকর্তারা। এ থেকে অবশ্য বিদেশি অর্থও ঘরে এসেছে। অর্থাৎ নিজের কাজের পাশাপাশি মহাকাশ অভিযানের বাণিজ্যিকীকরণ করে একই যাত্রায় দুটো ফল পেলেন ভারতের মহাকাশ দফতরের কর্তারা।

মহাকাশ অভিযানের বাণিজ্যিকীকরণ অবশ্য বিরল ঘটনা নয়। এর আগে ৪৫টি ছোট ও মাঝারি মাপের বিদেশি উপগ্রহকে মহাকাশে পাঠিয়েছে ইসরো। ২০০৮ সালে একসঙ্গে ৯টি বিদেশি উপগ্রহ পাঠানোর রেকর্ডও রয়েছে ইসরোর। শ্রীহরিকোটার সতীশ ধবন মহাকাশ কেন্দ্রের অধিকর্তা পি কুন্নিকৃষ্ণণ বললেন, 'আজ আরও ৬টি উপগ্রহকে মহাকাশে পাঠিয়ে আমরা হাফ সেঞ্চুরি করলাম। ইসরোর এই সাফল্য দেশকেও গর্বিত করেছে।'

উপগ্রহ উৎক্ষেপণে ইসরোকে কেন বেছে নিচ্ছে উন্নত দেশগুলি? ইসরোর ইঞ্জিনিয়ারদের একাংশের মতে, উৎক্ষেপণ প্রযুক্তিতে ভারত বিশ্বের প্রথম সারিতে পড়ে। তার ওপর এদেশে উৎক্ষেপণের খরচ অনেক কম। তাই উৎক্ষেপণের বরাত দেওয়ায় অনেক দেশেরই প্রথম পছন্দ ভারত। এবারের বরাত পাওয়ার পিছনে অবশ্য অন্য একটি কারণও রয়েছে বলে মনে করছে ইসরোর কয়েকটি সূত্র। মূলত সমুদ্রে নজরদারি ও জিপিএস পরিষেবা দিতে সক্ষম এই উপগ্রহগুলি আকারে ছোট ও ওজনে কম। ফলে শুধু এই উপগ্রহগুলির জন্য গোটা একটা রকেট পাঠাতে হলে খরচের বোঝা বাড়াত। ফলে, সেটাও ইসরোর বরাত পাওয়ার বড় কারণ বলে মনে করছেন অনেকে।

বিষয়টি আরো সহজভাবে ব্যাখ্যা করেন ইসরোর এক বিজ্ঞানী। তিনি বলেন, ধরা যাক কোনও ব্যবসায়ীর ১০০ কিলোগ্রাম মালবহনকারী একটা ট্রাক রয়েছে। কিন্তু তাঁর মালপত্রের ওজন ৮০ কিলোগ্রাম। ফলে বাকি ২০ কিলোগ্রাম ফাঁকা না রেখে তিনি অন্য কোনও ব্যবসায়ীর জিনিস নিয়ে গেলেন। তাতে আয়ও বাড়ল। পাশাপাশি দ্বিতীয় ব্যবসায়ীও কম খরচে মাল গন্তব্যে পাঠাতে পারলেন। ওই বিজ্ঞানীর মতে, গোটা ব্যাপারটা এক কথায়, 'সরস্বতী সাধনায় লক্ষ্মীলাভ আর কি।'

সে যাই হোক, উৎক্ষেপণ সফল হতেই টুইটার ফেসবুকে শুভেচ্ছাবার্তার ঢল নামে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী টুইটারে ইসরোকে অভিনন্দন জানান। আবার এই প্রকল্পের জন্মবৃত্তান্ত নিয়ে ফেসবুকে স্মৃতিচারণ করেছেন পুণের ইন্টার ইউনিভার্সিটি সেন্টার অফ অ্যাস্ট্রোনমি অ্যান্ড অ্যাস্ট্রোফিজিক্স (আইইউসিএএ)এর বর্তমান অধিকর্তা সোমক রায়চৌধুরী। লিখেছেন, ১৯৯৬এ ইসরোর বেঙ্গালুরু সদরের বৈঠকে এমন একটি প্রকল্পের প্রস্তাব উঠেছিল। ইসরোর তৎকালীন চেয়ারম্যান কৃষ্ণস্বামী কস্তুরীরঙ্গণ তাতে সায় দিয়েছিলেন।

মুম্বইএর টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ, পুণের আইইউসিএএ, বেঙ্গালুরুর ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ অ্যাস্ট্রোফিজিক্সের মত ভারতের প্রথম সারির গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সেই পরিকল্পনাকেই বাস্তব রূপ দেয় ইসরো। এই সাফল্যের হাত ধরেই মহাকাশ গবেষণায় নতুন ধাপ টপকে গেল ভারত। এ যাবৎ মহাকাশ কিংবা চাঁদ্রম ঙ্গলের মধ্যে তার যাতায়াত সীমাবদ্ধ ছিল। এবার মহাকাশে নিজস্ব পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র মজুত করে জ্যোতির্বিজ্ঞান, জ্যোতিঃপদার্থবিদ্যার তাত্ত্বিক গবেষণাও ভারত শুরু করে দিল। চলে এল অভিজাত তালিকায়। সেটা আবার কী রকম? এর আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (সঙ্গী ইউরোপীয় ইউনিয়ন), রাশিয়া ও জাপান এ রকম গবেষণায় হাত দিয়েছে। তালিকায় ভারতই হচ্ছে চতুর্থ দেশ। 'চাঁদ্রম ঙ্গলের সফল অভিযানের সুবাদে মহাকাশ অভিযান ও উৎক্ষেপণ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে মার্কিন মহাকাশ সংস্থা (নাসা) এবং ইউরোপীয় মহাকাশ সংস্থার (ইসা) সঙ্গে টক্কর দেওয়ার জায়গায় আমরা আগেই চলে এসেছিলাম। এ দিনের সাফল্য সেই মুকুটে আর একটা উজ্জ্বল পালক জুড়েছে।' দাবি এক বিজ্ঞানীর।

মহাজাগতিক কাজ্ঞকারবার খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণের স্বার্থে অ্যাস্ট্রোস্যাটে পাঁচপাঁচটা 'চোখ' বসানো হয়েছে। তার অন্যতম ৪০ সেন্টিমিটার ব্যাসের একটি আল্ট্রাভায়োলেট বা অতিবেগুনি রশ্মি টেলিস্কোপ। মাঝারি ক্ষমতার এক্সরশ্মি চিহ্নিত করার জন্য আছে 'লার্জ এরিয়া জেনন প্রোপোরশনাল কাউন্টার'। সঙ্গে কম ক্ষমতার এক্সরশ্মি সন্ধানী টেলিস্কোপ। উচ্চ শক্তির এক্সরশ্মি ছবি ধরতে রয়েছে একটি ক্যাডমিয়াম জিঙ্ক টেলুরাইড কোডেড মাস্ক ইমেজার। আর তাল মিলিয়ে মহাবিশ্বে এক্সরশ্মির উৎস খোঁজা হবে স্ক্যানিং স্কাই মনিটর (এসএসএম) মারফত। আইইউসিএএ এবং ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ অ্যাস্ট্রোলিজিক্সের গবেষকদের বক্তব্য, ব্রাহ্মাণ্ডের রহস্য উদ্ঘাটন করতে হলে কোনও এক ধরনের রশ্মি চিহ্নিত করাটাই যথেষ্ট নয়। তাই এত আয়োজন।

ব্রাহ্মা-ের রহস্য সন্ধানে ১৯৯০এ নাসা ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন যৌথভাবে 'হাবল' নামে একটি টেলিস্কোপ পাঠায় মহাকাশে, গত ২৫ বছর ধরে যে নানা ধরনের তথ্য জুগিয়ে আসছে। ২০০৫এ জাপান, তার পরে রাশিয়া একই ধরনের টেলিস্কোপবাহী উপগ্রহ মহাকাশে পাঠালেও হাবলের তথ্যই ছিল গবেষকদের মূল ভরসা। এখন অ্যাস্ট্রোস্যাটকে অনেকে 'ভারতীয় হাবল' হিসেবে ডাকতে শুরু করেছেন। দুয়ের তুলনাও শুরু হয়ে গিয়েছে।

ইসরোর কর্তারা অবশ্য প্রকাশ্যে এহেন তুলনায় যেতে নারাজ। তাঁরা বলছেন, হাবলের সঙ্গে অ্যাস্ট্রোস্যাটের বিস্তর ফারাক। ঘটনা হল, এই সূত্রেই ইসরোর চেয়ারম্যান এ এস কিরণকুমার তুলে এনেছেন ভারতীয় প্রকল্পের 'নিজস্বতা'র প্রসঙ্গ। জানিয়েছেন, হাবলঅ্যাস্ট্রোস্যাট তুলনা চলে না ঠিকই কিন্তু অ্যাস্ট্রোস্যাটে এক্সরশ্মি বা অতিবেগুনি রশ্মি ধরার যে টেলিস্কোপ আর স্ক্যানিং স্কাই মনিটর নামে যন্ত্র বসানো রয়েছে, তা বর্তমান সময়ের তুলনায় যথেষ্ট আধুনিক। 'হাবল অনেক বড় ক্ষেত্রে গবেষণার জন্য তৈরি। আমরা অত বড় আকারে কিছু না করলেও স্বাতন্ত্র বজায় রেখেছি।' মন্তব্য তাঁর।

সরাসরি না বললেও, উন্নত দুনিয়ার উদ্দেশ্যে কার্যত চ্যালেঞ্জই ছুঁড়েছেন ইসরোর চেয়ারম্যান।

নিশীথকুমার পাল
শিক্ষাবিদ, প্রাবন্ধিক

ঐ দূরাগত চার্চের ঘণ্টাধ্বনি

দেবী রায়

যেন মাটি ফুঁড়ে ভৌতিক পায়ে উঠে আসে– সে!

ঢিবির খাঁজে মাটির দেওয়াল...
– এ কি বাড়ি, না বাড়ির ক্যারিকেচার?
– কার প্রপিতামহ খক্ খক্ কাশে?

এতক্ষণ যিনি ছিলেন নির্ভরযোগ্য সঙ্গী,
একটা বাঁকের মুখে কোথায় যে উধাও।
তার পাথুরে মুখ, একজোড়া চোখ কথা বলছিল
– প্রতিবাদ? জানেন প্রতিবাদের সম্যক অর্থ?

গ্রামে ঢুকে পেটাতে পেটাতে নিয়ে যায় কোতোয়াল
নিরীহ, সরল আদিবাসীদের।
দিন দিন আতঙ্কের থাবা বসে জাঁকিয়ে।

পেটের ক্ষিধে বড় সাংঘাতিক বাবুসাব,
এ গাঁয়ের মেয়েরা বাহিরে যায়– কাজে–
আর অন্তঃসত্ত্বা হয়ে ফেরে...

পত্রকারের কানে ভাসে,
ঐ দূরাগত চার্চের ঘণ্টাধ্বনি!

দেবী রায় ভারতের কবি

তুমি জল অথবা অশ্রুরেখা

রোকসানা আফরীন

কাকে যেন খুব বেশি বাঁচাতে চেয়েছি বলে
দুইরাত্রি ভেসে গেছি
অনাথ সবুজ অশ্রুজলে
ও তরল ও আমার মোহমায়া ত্রুটি বিচ্যুতি
সরল পথের ধূলি কেন তুমি পরপারে
রয়েছ দাঁড়ায়ে–
অথবা করেছ ক্ষমা অন্তহীন জলের প্লাবনে
জলজ জীবন জানে চক্রাকারে সাজাতে পৃথিবী
আকণ্ঠ ডুবেই যাচ্ছি তোমার পথের দিকে চেয়ে
হয়তো আসবে কাছে অথবা আসোনি বহুকাল
হাজার বছর ধরে তোমাকে ডেকেছি কাছে
তোমাকেই ভালবাসিয়াছি
আমার আরাধ্য তুমি, অতল জলের ঢেউ
সূর্যমুখী অথবা রক্তমুখী
লাল প্রজাপতি...

গুজরান

মণীশ মৌলিক

প্রাকৃত হাওয়ায় ক্ষুধা সনাতন ওড়ে,
গা ঝাড়া দেয় জোনাকিপ্রধান রাত।
খোয়াব চূর্ণ, তার প্রভাবে নিদ্রাও টুটে যায়;
পড়ে থাকে শুধু স্বপ্নগুঁড়োর রৌশন ঝিকিমিকি।
নিশিভাঙা ভোর বিস্মিতচোখে দেখে–
দু'পারে দু'জন, মধ্যে সুতোর সংশয়াকুল লাছি;
এই পৃথিবীর হালকা দরদে বোনা
রঙিন চাদরে আমরা এখনও আছি।

সন্দেহ শতভাগ। আর
আকাঙ্ক্ষা পাঁচসিকি।
দু'জনের কাছে দু'জনই জীবনপ্রার্থী–
খাদ্মখাদক। আর শোলা, টিকটিকি।

তফাতে দু'জন, মধ্যে সুতোর সংশয়াকুল লাছি;
রঙিন চাদরে এভাবে আমরা বহুকাল বেঁচে আছি।

মণীশ মৌলিক ভারতের কবি

গার্ল ফ্রেন্ড

সরকার মাসুদ

এক.
সে বৃষ্টি আসার আগে কি কি ভালবাসে?
ধোয়া চুলের ভেতর দিয়ে চলে যাওয়া ঠাণ্ডা বাতাস
দেয়ালে বসে থাকা বিহ্বল দাঁড়কাক...
গাছপালার মাথায় সিসার আকাশ নেমে আসে!

খর রোদের দুপুরে সে কি কি ভালবাসে?
কৃষ্ণচূড়া যেদিকে মেলেছে ডানা, ঐদিকে চেয়ে থাকা?
লেবুর আচারে জমিয়ে রাখা গোপন শিহরন...
পাহাড়ের চুম্বকের কথা শুনে সে কেবলই হাসে!

এমন মেয়েকে ভালবাসতেও ভয়
বার বার আমার শামুকের ছবি মনে পড়ে
জটিল বান্ধবী কথা বলে না, করে আত্মক্ষয়;
স্রোতের আবেগে কালিগঙ্গার সাঁকো অল্প অল্প নড়ে।

দুই.
যখন বাতাস থাকে না নৌকার পালে
বান্ধবীর চোখের দিকে সরাসরি তাকালে
শাদ্মখ য়েরি মেঘ খুঁড়ে চলে যন্ত্রণামধুর নীরবতা
অন্ধকার পেকে ওঠে গ্রীষ্মের আকাশে,
আমি তার সাথে বলি নানা তামাশার কথা
দূর জঙ্গলের বিষণ্ন ময়ূর হাঁটে পাশে পাশে!

মেঘ বালিকা

দিলরুবা রুবি

মেঘ বালিকা
আজ এই শেষ বিকেলটুকু
আমার জন্যে রাখো।
বাতাস তোমার কানে
যতই করুক কানাকানি
তুমি ভুলো না ওর ছলনায়।
দেখ গোধূলীর সোনার আলোয়
কেমন মায়াবী স্নিগ্ধ চারপাশ
এস আমার চোখে চোখ রেখে
বস ক্ষণকাল।

মেঘ বালিকা
আমার যত কথা ছিল
ছিল যত ব্যথা, বলব সবই আজ।
শুধু তুমি একটু বস
ফেলে তোমার কাজ।
মিথ্যা প্রলোভনের কথায় ভুলে
নূপুর ভেবে পরেছি যে শিকল
আমি পায় ছিঁড়ব আজি তাও
শুধু একটি বিকেল আজ
আমায় তুমি দাও।

মেঘ বালিকা
কথা দিলাম আমি আর
দেখব না স্বপ্ন কোনদিন
বুনব না ছেঁড়া সুতোয়
কল্পনার রঙিন জাল।
হাঁটব না চন্দনের বনে
জড়িয়ে কারো হাত।
পড়বে না কারো প্রতিচ্ছবি
আমার চোখের আয়নায়।
কথা দিলাম তোমায়।

মেঘ বালিকা
দেখ সন্ধ্যাতারা হাসছে কেমন
চাঁদের কোলে।
জানি এবার যাবে চলে
সাগরপারের অন্য কূলে
আবার যেদিন আসবে ফিরে
খুঁজো না আমায়।

অক্টোবরে বর্ষণ

মমি তাহমিন

সে ঠায় দাঁড়িয়ে ছিল,
একটু কুঁজো হয়ে
প্রচণ্ড ঝোড়ো বাতাসে কাঁপতে কাঁপতে।
হাতের বন্ধ ছাতা থেকে টপটপ গড়িয়ে পড়া জল
একটা ছোট ধারা হয়ে মিশে গেল
এই মাঝ অক্টোবরের প্রবল বর্ষণে
প্ল্যাটফর্ম ভাসানো জলের স্রোতের সঙ্গে
মৃত মাছের মত ঘোলাটে চোখে।
এক জন্মের হাহাকার নিয়ে,
নিমগ্ন হয়ে সে তাকিয়ে ছিল
শূন্য প্ল্যাটফর্ম থেকে দূরে,
ত্ম ন্নেক দূ রে
দমকা বাতাসে ফুলেফেঁপে উঠেছিল তার স্কার্ট
আর বৃষ্টির ছাঁট এসে লাগছিল মুখে
সোডিয়াম আলোয় সাদা হয়ে ওঠা বৃষ্টির সুতীব্র ফোঁটা
তার ভোঁতা অনুভূতির স্তম্ভে আজ তোলে না কোন কাঁপন
কী ভীষণ নির্বিকার হয়ে দেখছিল বৃষ্টি...
এই অক্টোবরে আচমকা নেমে আসা প্রবল বৃষ্টি
এক সময় এই বৃষ্টির শব্দ
– যা তার কাছে মনে হত হার্প্পএর সুললিত সংগীত –
তাকে জাগিয়ে রাখত সারারাত।

ট্রেন থেকে নেমে ব্যতিব্যস্ত মানুষ
দ্রুত স্টেশন ছেড়ে গেল যে যার মত।
তবুও সে দাঁড়িয়ে–
মাঝ অক্টোবরের এই প্রবল বর্ষণে
শূন্য প্ল্যাটফর্মে– একা,
তবে আজ আর কারও অপেক্ষায় নয়।

মাপকাঠি

রণজয় মালাকার

মানুষ অনেক রকম।
ভাল মন্দ বোকা হাবাগোবা,
কেউ বা ধুরন্ধর।

ধর্মভেদেও মানুষ খণ্ডবিখণ্ড, ছিন্নভিন্ন।
পাশাপাশি– ধনীদরিদ্র, মানুষ্নঅমানুষ
শিক্ষিতঅশিক্ষিত– এসব তো আছেই।

ওগুলোর কোনওটাই পুরোপুরি ঠিক নয়।
একটাই তো জুতসই মাপকাঠি বাছার–
ঝিঙেশশা লাউকুমড়োর মত,
মানুষও দুই রকম, মাটির আর মাচার।

রণজয় মালাকার ভারতের কবি

নতুন
HARPIC
ALL IN 1
ট্রাই করেছেন কি?
কঠিনতম দাগ দূর করে
৯৯.৯% জীবাণু ধ্বংস করে
দুর্গন্ধ দূর করে
HARPIC
POWER PLUS
ALL IN 1

ধা রা বা হি ক উ প ন্যা স

রূপকথা ভূতকথা ভালবাসা

সালেহা চৌধুরী

(পূর্ব প্রকাশিত-র পর)

সতেরো.

মমতাদের বাড়ি থেকে নিমন্ত্রণ এল। ওর বড়দি এসেছে কলকাতা থেকে। বুবুর যে কারণে তেমনি কোন কারণে। তবে বড়দির ব্যাপার আলাদা। বিয়ের বিশ বছর পর এই তার প্রথম সন্তান। ওরা বুবুকে তার তিনমেয়েসহ সঙ্গে মিঠু ও কাজলকে খেতে ডেকেছে।

মাসিমা নিজে এসেছিলেন নিমন্ত্রণ করতে। বড় গোল টিপ কপালে, লালপাড় শাড়ি, শাঁখা ও সোনার চুড়িতে চেনা যায় না। মিঠু সুহাসিনীমাসিকে বসতে বলে সযত্নে। বুবু বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। আর মা এসে বলেন– কি সৌভাগ্য! আপনি?

সুহাসিনীমাসি ও মায়েতে এক ঠাণ্ডা লড়াই চলে। মাসিমা এ বাড়ির কোন খাবার খান না। ওদের মত এ বাড়ির চুলো প্রতিদিন গোবরলেপা হয় না তাই। কাজল জানে মমতা কখন বলবে– আমাকে এখন ধরিস না। বলবে এখন নয় পরে আমরা রান্নাঘরে গিয়ে চালতামাখা করব। মা-ঠাকমা যখন ঘুমোবেন। তবু মা যান। তিনঘণ্টা কথা বলে চলে আসেন। কিন্তু চা খান না। আজ মাসিমা বড় মেয়ের সাধ দিতে এসে বুবুকে ডাকছেন সেই সাধে। তার সঙ্গে মিঠুপা ও কাজেলেরও আমন্ত্রণ। মা অবশ্য সরাসরি বলেননি, না ওরা যাবে। বলেন– সুহাসিনী পরে জানাব। সুহাসিনী মাকে দিদি বলেন। আর মা ওর নাম ধরে ডাকেন।

রেবা তুমি এলে বড় খুশি হব মা।

বুবু হাসেন। কিছু বলেন না। পাছে যেতে না পারেন তাই। কাজল বলে– মাসিমা পেয়ারা খাবেন। তিনি হাতে করে পেয়ারা নেন। বলেন– এখন যাই। বাড়িতে গিয়ে খাব।

আব্বা বিকেলবেলা কাজ থেকে ফেরেন। মা বলেন– শুনছ, ও বাড়ির মমতার মা আমাদের রেবাকে সাধে ডেকেছে। সঙ্গে মিঠু ও কাজল।

সেতো খুব ভাল কথা, বলেন আব্বা। ছোঁয়াছুঁয়ি বাছবিচার নিয়ে তার কোন মাথাব্যথা আছে মনে হয় না। বলেন– আমার কাছে কি অনুমতি চাইছ।

সুহাসিনী আমাদের বাড়িতে এককাপ চাও খায় না। আর আমার মেয়েরা ওখানে যাবে? খাবে?

আব্বা কাপড় বদলে বলেন– দেখ রেবার মা ওদের যে গোবরজলের নিয়ম আছে সেটা যে কত হাস্যকর সে তুমিও জান আমিও জানি। কিন্তু আমাদের তো অমন কোন নিয়ম নেই। তাহলে আমার মেয়েরা যাবে না কেন?

আব্বার এই অকাট্য যুক্তির কাছে মা রন্নদ্ধবাক। এরপর আর কি কথা বলা যায়? তবু বলেন মা– তুমি তো সব কিছু খুব সহজে দেখ। তোমার মত সকলে নয়।

সেটা তাদের সমস্যা। আমার মনে হয় রেবাদের যাওয়ার মতামত তুমিই দিতে পারতে।

কাজল খুশি হল সবচাইতে। বুবুর ফলসা শাড়ির আঁচলের মুঠি ধরে একদিন দুপুরে ওরা এল মমতাদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। কাজলের সুহাসিনীমাসির কথা শুনতে খুব ভাল লাগে। ভাবে ও মাসিমার মত মিঠে করে কথা বলা শিখতে হবে। হড়বড় করে নয়। তবু কাজলের ডাক পড়ে ওই বাড়িতে। যখন ওকে মাসিমা ও মেসোমশায়কে বই পড়ে শোনাতে হয়। উঠোনের মাঝখানে টুল পেতে বসে কাজল। তারপর গল্প পড়া চলে। মাসিমারা শোনেন। কাজল তালগুঁড়ের চা তক্তি খেয়ে চলে আসে। মমতা, চন্দন, তুলসি, অতসি তাকিয়ে দেখে কাজলকে। শব্দে শব্দে ভুলিয়ে দেয় এই দু'জনকে। কেন কাজলের ডাক পড়ে বাড়িতে এত মানুষ থাকতে কাজল জানে না। ওরা কি সত্যিই ওর গল্প পড়া ভালবাসেন, না স্নেহের প্রকাশ?

তোর মত এত নির্ভুলভাবে আমরা পড়তে পারি না তাই।

কচু। আসলে স্নেহ করেন আর সেটা ঠিকমত বলতে পারেন না তাই।

তাহলে তাই।

মাসিমা বলেন– আমার কাজলমা একদিন রাজরানী হবে। কাজল হেসে ফেলে এমন কথায়।

বাড়িতে ঢুকতেই– এস রেবা মিঠু আর কাজল বলে মাসিমা এগিয়ে আসেন। সঙ্গে কেবল রীণু। আর দু'জন খেয়ে নানুর গলা ধরে গল্প করছে। মাসিমার এমন মধুর ডাক আর একবাড়ি মানুষের আপ্যায়ন। বেশ লাগে কাজলের। উঠোনের জলচৌকিতে চুপ করে বসে আছে ঠাকমা। তার মনের কথা কেউ জানে না। কাজল মমতার কানের কাছে মুখ এনে বলে– মম তোর ঠাকমার খবর কি? কিছুই তো বলছে না।

আমার ঠাকমা তো সারাক্ষণই চুপচাপ। কখনো কথা বলতে দেখেছিস? ওঁর কথা বাদ দে। শুধু মনে রাখ ঠাকমার আপত্তি থাকলে মার বাবারও সাধ্য হত না এ বাড়িতে তোদের ডাকা। ওসব চুপ থাকা নিয়ে ভাবিস না।

পাশাপাশি বসেছেন বড়দি আর বুবু। পরিবেশন করছেন মাসিমা। তার হাতভর্তি শাঁখাচুড়ি আর বালার স ঙ্গে চামচের ঝন ঝন শব্দ। বুবু বলেন– বাপরে মাসিমা এত কিছু?

শোন কথা মেয়ের। এত আবার কি?

কাজল জানে এঁটো যাতে না হয় সে জন্য একটু দূর থেকে খাবার পাতে তুলে দেন মাসিমা।

সবশেষে চালতার টক এবং মধুরেণ সমাপেয়ৎ ছানার পায়েস। ঘরে বানানো সন্দেশ। ফুল ফুল খাঁচে ফুলের মত সুশ্রী।

শান্ত হয়ে বসে থাকা ঠাকমা চেয়ে দেখছেন। বোধকরি কাকপাখি তাড়ানোর কারণে হাতে লাঠি। পাশের বাড়ির এক মুসলিম পরিবার তাদের বাড়ির উঠোনে বাড়িতে খাবার খাবে একি তার কাছে অভাবনীয়? হতে পারে। তার গৃহিণীজীবনে এমন ঘটনা ভাবাই যেত না। এখন পাকিস্তান তাই বোধকরি এমন ঘটনা সম্ভব হয়েছে। এখন তাই কেউ বলে না– বাছা খাওয়ার পর কলাপাতা মুড়ে বাইরে ফেলে দিয়ে এস।

বুবুর সঙ্গে ওরাও পান খেল। ছোট ছোট ফুলকাসার বাটিতে সেই ছানার পায়েস ও একটি সন্দেশ। দেখতেও বেশ। বুবু বললেন এমন কথা পান খেতে খেতে– ছানার পায়েস? খেতে কি অপূর্ব। তারপর চালতার টক আর মুগ ডালের নতুন রেসিপি শিখে নিয়ে ওরা বাড়িতে যাবে বলে ঠিক করল। মাসিমা আমরা এবার যাই।

এস। যাই বলতে নেই। বুবু ও বড়দি ঘন ঘন দেখা সাক্ষাৎ করবে কথা শুনে মনে হল। মাসিমা বলেন– রেবার লক্ষ্মীশ্রী দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

বুবু হাসেন। যে সুন্দর নয় বলে নামমাত্র মূল্যে বিকিয়ে গেছে তার আবার লক্ষ্মীশ্রী? বুবু মাসিমার পা ছুঁয়ে সালাম করে। আর এক অভাবনীয় ঘটনার মত ঠাকমার পা ছুঁতেই সাধ খাওয়া এই মুসলমান মেয়েটির হাতে একটি পাঁচটাকার নোট গুঁজে দেন ঠাকমা। দু'বাড়ির দেয়ালে জেগে ওঠে একটি সবুজ চারাগাছ। কি তার নাম? কাজল ভাবে। এই চারাগাছের নাম ভালবাসা। এবারে দু'বাড়ির মধ্যে ভালবাসাগাছ আলো দেবে।

বুবু অভিভূত। প্রথমে লক্ষ্মীশ্রী বিশেষণ। তারপর পাঁচটাকা।

সাধ খাওয়া মেয়ে কি করে খালিহাতে ঘরে ফিরে যায়।

নিজের বাড়িতে ঢুকেই মায়ের গায়ে হাত দিয়ে ঘুম থেকে জাগিয়ে কাজল বলে– মা শোন কি সাংঘাতিক ব্যাপার হয়েছে আজ।

কাজল আজ সত্যিই খুশি। এবাড়ি ওবাড়ি মমতা কাজল দেয়াল ধর্ম কিছু না। একেবারেই কিছু না ভালবাসার কাছে। সব মিথ্যে। জেগে ওঠা সবুজ চারাগাছই সত্যি। যে গাছ ধর্ম নয় জীবনের কথা বলে, ভালবাসার কথা বলে, আর বাবা যাকে বলেন মানবধর্ম।

আঠারো.

আহা কিযে মজার এই সব দিনরাত কাজল ভাবে। রীণু বিনুর দায়িত্বর অজুহাতে কতকিছু তাকে এখন করতে হয় না। মিঠুপা পাতা পাতা অংক ট্রানশেসন তাকে করাতে পারে না। মা ছোটখাটো কাজ থেকে অব্যাহতি দেন তাকে। আর মাঝে মাঝে– থাক আজ আর স্কুল যাব না এই বলে কাজল বাড়িতেই থেকে যায়। বুবুর অগাধ স্নেহে হাঁসের মত ভাসে কাজল। জীবন সহজতর ও আনন্দে খানখান। রীনুর জন্য কাগজের নৌকো ও আরো নানাসব জিনিস বানিয়ে সারা হল কাজল। ঘুড়ি ওড়ানোতে সাহায্য করল পবিত্র। মমতা এসে যোগ দিল সে আসরে।

পান্নাভাইতো স্টান্ডবাই আনন্দের বিশাল রিজরভয়ের। পারুল এল চালতামাখা আর ছোট ছোট কলাপাতা হাতে। এমনি সময়ে এক গভীর রাতে বুবুর কান্নায় ঘুম ভেঙে গেল কাজলের।

বুবুর ব্যথা উঠছে। এই ব্যথা চুপ করে মেনে নিতে পৃথিবীর সবচাইতে সর্বংসহা মেয়ে পারে না। বুবুও পারে না। তার নীল মুখ ও আর্তনাদ বাড়ির অনেককে জাগিয়ে দিল। কাজল কি করবে বুঝতে পারে না। বলে– কষ্ট হচ্ছে রে বুবু? বুবু চোখ মেলে বলে তুই রীণু বিনুকে দেখ। মাকে পাঠিয়ে দে। বলতে বলতেই উদ্বেগাকুল মা ঘরে প্রবেশ করে। সঙ্গে সঙ্গে মিঠুপা। বুবুর কথায় এ ঘর ছেড়ে রীণু বিনুর পাশে এসে শোয়।

রান্নাঘরে মিঠুপা পানি গরম করছে। লুঙ্গির উপর কোনমতে একটা কোট চাপিয়ে আব্বা সুশীলামাসিকে ডাকতে গেছেন। সুশীলানার্সকে সকলে চেনে। ফরিদপুরের শত শত বাচ্চা ওর হাতে হয়েছে। আব্বা দ্রুত হেঁটে চলেছেন। রিকশা কখন পাবেন কে জানে। রীণু কাছে সরে এসে বলে– ছোটখালা আমার ভয় করছে।

ভয় কিসের। আমি আছি না। বড়মানুষের মত গলা করে কাজল জানায়। তোদের একটি ভাই হবে এখন। ঠিক ভাই। আমি বলে দিলাম। মা একবার এ ঘরে এসে দেখে গেলেন কেমন আছে সকলে। রীণুবিনুর শরীর ঢেকে দিলেন বেডকভারে। তিনজন আধোঘুম আধো জাগরণে ভোরের প্রতীক্ষা করতে লাগল।

ফাল্গুনের রাতেও হিম হিম। বোধকরি আজকের রাতই এমন। চুমকিকে মা রেখে গেলেন এ ঘরে।

বুবু কেমন?

কেমন আবার। সুশীলা এসে পড়লে আমি বাঁচি।

রীণু ও কাজল খুব জোরে আলাহকে ডাকতে লাগল। বিনু ও চুমকি তখন বেভোর ঘুম। চারজনের মাঝে কাজল এখন সবচাইতে দায়িত্বশীল। সে এখন মোটামুটি এই তিনজনের মা।

মিঠুপা পানি গরম ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজে ব্যস্ত।

বাইরের দরজা দিয়ে কথা কথা বলতে বলতে এলো সুশীলা নার্স। দু'দিন আগে বড়দির জন্য এসেছিলেন তিনি। বড়দির বিশ বছর অপেক্ষার পর একটি মেয়ে হয়েছে। মমতারা নাম দিয়েছে নয়নতারা। ছেলে নয় বলে মন খারাপ বড়দির। শাশুড়ি মন খারাপ করবেন। কিন্তু কিছু করার নেই। এভাবে কতক্ষণ কাজল ও রীনু জেগেছিল জানে না।

ঘুম ভাঙল ভোর পাঁচটায় আজানের শব্দে। তিনমেয়ের পর বুবুর একটি ফুটফুটে ছেলে হয়েছে।

উনিশ.

বুবুর ঠিক বুকের কাছে ছোট্ট একটি বিছানায় ঘুমিয়ে ছিল সেই পাখির মত মানুষটি। ধবধবে ফর্সা রং দুলাভাইয়ের মত। মাথা ভর্তি কুচকুচে কালো চুল। ওদের সকলের চাইতে একেবারে আলাদা চেহারা। এতো সুশ্রী শিশু ওরা আগে কখনো দেখেনি। তিনবোন গর্ব ও আনন্দে দেখে দেখে সেই ভাইটিকে। কাজলের দিকে তাকিয়ে বুবু বলেন– শোন বাবু এই তোমার ছোট খালা। একেবারে ছোটমা।

বুবুর গায়ে শেকতাপ দেওয়া চলছে। মা বলেন– এ ঘরে বেশিক্ষণ নয়। মমতারা স্নানের আগে একবার এসে দেখে গেল বাবুকে। ওদের আঁতুর ঘরে যখন তখন আসতে নেই চলিশদিন না পেরোলে। ওদের কতকিছু যে করতে নেই ভাবে কাজল। সবাই চলে গেলে কাজল বলে– আমি ওকে ডাকব নীল বলে। বুবু হাসলেন। – মিষ্টি নাম। তবে মিঠু আবার কোন নাম ঠিক করে বসে আছে দেখ, ওর সঙ্গে কথা বল। বলে আবার কাজল– না হলে পিয়াল। বুবু আবার হাসলেন। হ্যাঁ না কিছু না বলে।

নতুন বাচ্চার ঘরে চিরকালই একধরনের গন্ধ থাকে। বেবি পাউডার, বোরিক পাউডার, আগুন, সরষের তেল এইসব। এ ছাড়া বাবুর গায়ে এক নিজস্ব গন্ধ আছে। গন্ধ কাজলের কাছে অর্থবাহী। গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ এই নিয়েই তো পৃথিবী। মনে আছে ছোটফুপুর মৃত্যুর পরে যে ধূপকাঠি জ্বলেছিল আজো কোথায় সেই ধূপকাঠির গন্ধ তাকে ঠিক একইভাবে বেদনার্ত করে। আর মিঠুআপার স্পেশাল আতর, পুলকিত। ছোটফুপুর মাথার কাছে সুর করে যে কোরানশরীফ পড়ছিল তাকেও মনে পড়ে এই ধূপের গন্ধের সঙ্গে।

চুপ করে বসে কি ভাবছিস? বুবু বলেন। তারপর বলেন– তুই আর মিঠু মিলে যে নাম রাখবি তাই হবে বাবুর নাম। – পিয়াল নামটি আমার ভাল লাগে বলে কাজল।

বেশ নাম পিয়াল। রীণ, বিনু চুমকি আর পিয়াল মন্দ কি। রীণু বিনুর পর মিনু নামটি রাখিনি কেন জানিস? সকলে বলেছিল– মিলিয়ে মিলিয়ে মেয়েদের নাম রাখছিস তাই মিলিয়ে মিলিয়ে মেয়ে হচ্ছে। তাই ওর নাম চুমকি করেছিলাম।

আর তাইতো পিয়াল এল। অনেক সময় এসব কথার অর্থ হয়। বুদ্ধিমতী মেয়ের মত বলে কাজল।

নীল নামটায় অসুবিধা। কারণ যেদিন সবুজ জামা পড়বে সেদিন কি অবস্থা?

সেদিন ওর নাম হবে সবুজ বা পান্না। কাজল বলে।

রোজদিন একবার করে নাম বদলানো বড় কঠিন রে কাজল। বুবু বলেন।

কাজল অন্য ঘরে আসে। তেলমালিশ চলবে বুবুর। দাই এসে গেছে। জানালার ওপারে লাল পেট নিয়ে গিরগিটি হেঁটে চলেছে ডাল থেকে ডালে। এ গিরগিটিকে কাজল চেনে। দূরের মাঠে ও বাড়িতে পান্নাভাই কি সব লেখালেখি করছেন। মাঠের এককোণে মাধবীলতার কোলের কাছে বেতের টেবিল পাতা। আজ বিকালে ব্যাডমিন্টন খেলায় কাজল কি যেতে পারবে? অনেকদিন যাওয়া হয়নি। মা বড় হওয়ার কথা বলবেন। কাজলের সাদা কর্কের নাচ, দুরন্ত পায়ে ছুটোছুটি, বিপুল প্রবল পাখির মত সময় বিকেলের কথা ভাবছে। মনে মনে বলে– পুকুরে গোসল করব না সেটা ঠিক আছে। তাই বলে বিকালে কোথাও যেতে পারব না সেটা মানব না। সেটা যদি আমাকে করতে বলা হয় বিদ্রোহী হব। এখন মিঠুপাকে বলা দরকার যে নাম নিয়ে সে দিনরাত ভাবছে। না হলে মিঠুপা এমন এক নাম রেখে দেবেন যাকে বদলায় সাধ্য কার।

মিঠুপা পড়ার টেবিলে। কি যেন লিখছে। কাজল গিয়ে পাশে দাঁড়ায়। এ বাড়ির বিবিধ ঘটনায় জড়িয়ে মিঠুপার অনেক সময় খরচ হচ্ছে। তাই সময় পেলেই রাতবি রেতে দিনেদুপু রে পড়ার টেবিল আঁকড়ে থেকে সময় অপচয় পুষিয়ে নেয়।

মিঠুপা।

বলুন। লেখা থেকে চোখ না তুলে মিঠুপা বলে।

আমি বাবুর নাম ঠিক করেছি।

তাই নাকি? বাবুই না চড়ুই? শালিক না গাঙচিল?

পিয়াল। বলে কাজল। কোনপ্রকার ভণিতা বাদ দিয়ে। মিঠুপা কঠিন চোখে তাকায়।

পিয়াল? মানে জানিস?

মানে আবার কি। তুইতো সারাদিন শুনিস– ওই মালতিলতা দোলে/ পিয়ালতরুর কোলে।

সেতো গান। কিন্তু এই ছেলে যেদিন বড় হবে, যুবক হবে তারপর বড় মানুষ সকলে ডাকবে– এই যে পিয়ালসাহেব এদিকে একটু আসুন তো তখন কি হবে? মিঠুপা বলে।

কি হবে? পিয়ালসাহেব তখন সেই ডাকে সাড়া দেবেন।

কচু। এ একেবারে মেয়েলি নাম। তারচেয়ে চিনেবাদাম বলে ডাকলেই হয়।

চিনেবাদাম? পিয়াল ও চিনেবাদামে কি সম্পর্ক?

পিয়াল মানে ভক্ষ্যবিজ। মানে যে বিজকে ভক্ষণ করা যায়। তারচেয়ে পুঁইশাক রাখলেই হয়।

মানে মিঠুপা কিছুতেই পিয়াল নামটি রাখবেন না।

আপনি কি এমন পুরুষালী নাম ঠিক করেছেন শুনি।

ময়ূখ। বলে মিঠুপা।

হোয়াট?

ময়ূখ। বলে মিঠুপা। এর মানে সূর্যের কিরণ আলো জ্যোতি।

মানে ভাল হতে পারে। কিন্তু শুনতে কর্কশ।

তুলো তুলো নরম নামের চেয়ে ছেলেদের জন্য এই নামই ভাল।

তাহলে পেরেক রাখলেই হয়। বলে কাজল।

তা হয়। তাহলে পেরেকই হোক ওর নাম।

কিন্তু ওর নাম তো ঠিক হয়ে গেছে। এর স্বপক্ষে যুক্তিও ঠিক। কেন পিয়াল হবে ওর নাম। আমি অবশ্যই ডাকব পিয়াল। আর রীণু বিনু চুমকি। তুই একা ডাকিস ময়ূখ করে।

দলবল নিয়ে ঠিক হয়ে গেছে? তাহলে আমার কাছে আসা কেন?

দলবলের ইচ্ছে জানিয়ে গেলাম।

জানালায় ফুল ফুটে আছে। এত কাজের ভেতরে ফুলের কথা ভোলে না মিঠুপা। কাজল নিচু হয়ে ফুলের গন্ধ টেনে নেয়। তারপর বলে– প্রত্যেকটি মানুষের দুটো নাম থাকে।

প্রত্যেকের নয়। কিছু কিছু মানুষের। তার মানে ওর ডাক নাম হবে পিয়াল আর ভাল নাম ময়ূখ ইসলাম।

খারাপ কি?

আব্বাকে বলিস। দেখিস কি বলে সকলে। আমরা পাকিস্তান করেছি ওই সব ভাল নাম রাখার জন্য? ভাল নাম মানেই আরবি নাম। সকলেই জানে। এমনিই কিছু বলবে। এবারে তুই আসতে পারিস। এবারের পরীক্ষা যে কি হবে বুঝতে পারছি। কাজল যেতে যেতে বলে– কাল পান্না তোর কথা বলছিল?

কি কথা? মিঠুপা শুনবে না পান্না কি বলেছে ব্যাপার এমন নয়। সে আবার বলে– কি বলেছে শুনি।

বলেছে তোমার মিঠুপার ব্যক্তিত্ব ওর মুখের রেখা বাড়াবে। সেটা কোন কাজের কথা নয়।

মিঠুপা বড় বড় চোখে তাকিয়ে আছে। কাজলের মুখের দিকে। তারপর তেমনি টোলহীন ব্যাক্তিত্বে বলে– ইউ মে গো।

ওকে ম্যাডাম। মনে মনে মিঠুপাকে স্যালুট ঠুকে ঘর থেকে বেরোয় কাজল।

কিন্তু কাজল গেলেই মিঠুপা আয়নায় সেই অনাগত মুখের রেখার খোঁজ করেন। মনে হয় চোখের কাছে কাকের পায়ের মত রেখা। সেখানে অনেকন ক্রিম ঘসে মিঠুপা। আইএ পরীক্ষার পড়া বাদ দিয়ে।

যাক শেষপর্যন্ত মিঠুপাকে শঙ্কিত করা গেল। মনে মনে হাসে কাজল। কি সব দেয়াল দিয়ে রাখে চারপাশে। যেন চারপাশের মানুষ ওকে গিলে খাবে। এখন যে মিঠুপা আয়নাকে জিজ্ঞাসা করছে– বল তো আয়না আমি কি রেখামুক্ত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। মিঠু একটু কাজলে, একটু টিপে আর একটু পাউডারে আয়না ও নিজেকে স্বস্তি দিল। তারপর আবার ভোলানাথবাবু না হলে মিস্টার মায়ার্স। ইস কী কঠিন জীবন তোমার মিঠুপা, কী কঠিন সাধনা!

কুড়ি.

বিনুর হাত ধরে বাগানে ঘুরছিল কাজল। ফুলপাখি দের ব্যাখ্যায় বিনুকে জ্ঞানী করে। ফড়িং প্রজাপতির খবর। ওদের ধরা। তারপর পাতায় পাখা আঠা দিয়ে লাগানো এইসব। পথ দিয়ে পান্না কোথায় যেন চলেছে অনেক কাগজপত্র হাতে। কাজল চিৎকার করে ডাকে– পান্নাভাই ও পান্নাভাই।

পান্না ফিরে বলে– ডাকছিলি কেন।

কিছু না এমনি।

বাগানের কাছে সরে আসে পান্না। বলে– বিনু কেমন আছ তুমি?

আমি ভাল আছি।

রীণু কই?

আপাতত মিঠুপার জগতে। যে জগতে বই আর লেখা সেখানে। ওর অনেকদিন পড়াশুনা হয়নি তাই কি সব ট্রানশেসন অংক কষছে। ছাড়া পাবে খানিক পরে।

বেচারি! পান্নাভাই বলে। তারপর বলে– তোর কি ব্যাপার? পড়াশুনা নেই?

পান্নাভাইকে নকল করে বলে কাজল– আমি কি মিঠুপার মত ভাল ছাত্রী?

কি করছেন তোদের মিঠুপা? একটু সরে এসে ফিসফিসিয়ে প্রশ্ন করে সে।

পড়ছেন এবং পড়াচ্ছেন। বলে কাজল।

আমি তাহলে যাই। বলে পান্নাভাই উধাও।

পান্না চলে যেতেই লক্ষ্য করে রীণু এসেছে। সে একটু আগে এসে পেছনে দাঁড়িয়ে ওদের কথা শুনছিল। কাজল বলে– আচ্ছা ছাড়া পেলি তাহলে। তারপর বিনু যখন এক ফড়িংয়ের পেছনে কাজল বলে– জানিস রীণু পান্নাভাই না মিঠুপাকে ভালবাসে। রীনুর কাছে ভালবাসা শব্দটি এখনো টফি লঞ্জেসের মত। বলে– ভালবাসা ভাল জিনিস। তবু এটুকু ও জানে মেয়ে ও ছেলের ভালবাসার কথা লোকজনের সামনে বলা যায় না। তাই তেমনি ফিসফিসিয়ে প্রশ্ন করে রীণু– তুমি কি করে জানলে?

বোঝা যায়। বলে কাজল।

থাক ওসব বুঝেটুঝে আমাদের দরকার নেই। এবার আমরা চালতামাখা করি। মমতা বসে আছে আমাদের জন্য। ছোট ছোট কলাপাতা কেটে।

দুপুরের হলুদরোদ চারপাশে। রাস্তা কেমন জনশূন্য। হু হু হাওয়া দিচ্ছে থেকে থেকে। মমতাদের বাগানের অর্জুনতলায় বসে সকলে। চালতামাখা খেতে খেতে দু'হাতে সরায় রোদ আর হাওয়ার মাতলামিকে। চুমকি ঘুমিয়ে আছে নানুমনির গলা ধরে এক ভয়ানক খোক্কসের গল্প শুনতে শুনতে। গল্প শুনেছে যত প্রশ্ন করেছে তার চাইতে বেশি।

পুতুলের মত একতাল কাঁচাসোনা বুবুর বুকের কাছে। হলুদপাখির মত ওর রং। শালিকের মত ছোট্ট শরীর। সুচারু নাক এবং থোকা থোকা নরম চুল। নরম ব্রাশে সেই চুল আঁচড়েছিল কাজল। বুবু কি পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে গেছে হয়তো। আর মিঠুপা ভোলানাথ ও মায়ার্সে লুকিয়ে নিষিদ্ধ গ্রন্থের মত উল্টোরথের পাতা উল্টে চলেছে।

ওদের চালতামাখা আসরের কাছেই ছিট ছিট কচুর গাছ। সেখানে চিক চিক সোনারোদ। যে কচুকে কাজল বলে মৌলভীকচু আর মমতারা বলে বাবু কচু। যে কচুই হোক দেখতে বেশ। সেখানে যদি ফড়িং এসে বসে কি হয়? সে কি হওয়ার কারণে কাজলের আসর থেকে উঠে বিনু ছোটে ফড়িংয়ের পিছে। রীণুর চুল এসে পড়ল কপালে সেই সব এলোমেলো হাওয়ায়। কাজল বাঁ হাতে কপাল থেকে চুল সরায়। আর মমতা খুব ধীরে একটু আদর রাখে সেখানে।

ছোটখালা পাখি হতে চায় বলে রীণু। মমতামাসি তুমি কি হতে চাও?

আমি যা আছি তাই। মমতা।

এই ধুলোমাটির পৃথিবীর প্রতি গভীর আসক্তি মমতার। ও কেন পাখি হতে চাইবে? কাজলের দুচোখে খোলা আকাশ। আর দূরের মাঠ। দিগন্ত। এইসব। আর বড় চঞ্চল ও। বুঝতে পারে না এইসব চাঞ্চল্য

নিয়ে এই মুহূর্তে ও কি করবে। মার শাসন ও বাড়ির এইসব দেয়াল মাঝে মাঝে বড় বিরক্তিকর ঠেকে। কিন্তু জানে ছোটরা চিরকালই বড়োদের রাজত্বে বাস করে। আর না মানতে চাইলেই ধিঙ্গিপানা বলে চিহ্নিত হয় কাজলের মত মেয়েরা।

এবার চল বাড়িতে। রোদ পড়ে এল। চালতামাখার ভোজ শেষ। কাজল বলেছিল ওদের– বুঝেশুনে খাও। কিছু গড়বড় হলে সব কাজলখালার দোষ।

যা ভেবেছিল তাই। সকলেই উঠেছে শিয়েস্তা শেষ করে। আর চিরন্ননিফি তে হাতে করে মিঠুপা ঘুর ঘুর করছে। বুবু বারান্দায়। কোলে ময়ূখ বা পিয়াল।

পাড়া বেড়ানো হল আপনাদের। রীণুবিনুও কাজ লের পালস্নায় পড়ে টো টো কোম্পানি হচ্ছে। সারাদুপুর ধরে রাজ্যজয় করে ফিরলেন ওরা। বুবু ডাকলেন এখানে আয় কাজল। সারাদুপুর টো টো না করে একটু বিশ্রাম করলেই তো পারিস।

উনি করবেন বিশ্রাম। তোমার যে কি কথা বুবু। মিঠুপা বলে। মা ডাকলেন রীণুবিনু কে হাতমুখ ধুয়ে এসে দুধ মুড়ি খেতে।

উঠোনে তেমন রোদ নেই। এক ডাঁই কাপড় হাতে ছাদ থেকে নামে কাজের মেয়েটি। কাজল একবার ছাদে যায়। ওর নির্বিরোধ পুত্রকন্যার যত্ন হয়নি রীণুবিনুরা আসার পর। হয় তো এসব চলে যাবে অতসীর কাছে। রীণুবিনু ও কে খুব জ্ঞানী ও বয়সিনী করছে। বেশ একটু দায়িত্ব নিয়ে বেশ একটু বড় বড় ভাব।

একুশ.

তিনদিন পর ঘরে ফিরতেই ডাক্তারের গাড়ি দেখল কাজল। ননী ডাক্তারের কালো মরিস মাইনর। আর বুবুর ঘরে ডাক্তারের মেঘের মত স্বর। মাইক না থাকলেও একমাঠ মানুষকে স্তব্ধ রাখতে পারবে এমনি গলা। আব্বা এখনো অফিস থেকে ফেরেননি। কার অসুখ? বুবুর না পিয়ালের?

রীণুবিনু বারা ন্দায় বসে। কোন কথা নেই মুখে। কাজল বলে– কার অসুখ রে রীণু বিনু?

আমাদের ভাইয়ার।

কি হয়েছে পিয়ালের?

লালনীল অসুখ। বলে রীনু।

তড়িঘড়ি দরজায় উঁকি দিল কাজল। বুবুর সঙ্গে কথা বলছেন ডাক্তার। মা কাছে দাঁড়িয়ে। মিঠুপার মুখ চিন্তিত। ডাক্তার বলছেন দশদিন বয়সের একটি আসন্ন মানুষের ভবিষ্যতের কথা। কি হয়েছে তার, কেন হয়েছে, এরপর কি হতে পারে এইসব। যার নাম নিয়ে কাজল ও মিঠুর তর্ক এখনো ফুরোয়নি।

ননী ডাক্তার চলে গেলে কাজল ঘরে ঢোকে।

বুবু। এ ডাকে বুবু চোখ তুলে তাকান। কিছু বলেন না। মা বলেন কাজলের পর ওদের একটি ভাই হয়েছিল সেও লালনীল অসুখে মারা গেছে। কাজল অনেকবার মার কাছে এ গল্প শুনেছে। কল্পনায় একটি ভাইয়ের ছবি ভাবতে চেষ্টা করেছে। যে কাজলের পিঠাপিঠি বড় হত। কাজলের আজন্ম বন্ধু হত। মমতার ফ্রেমে বাঁধানো এক অদৃশ্য ছবি ঝোলে কাজলের চিন্তায়। যে এই পৃথিবীতে এসে চলে গেছে এমনি এক অজানা অসুখে। মা বলেন জিনে ধরা। আব্বা বলেন পেঁচোয় পাওয়া। সেদিনও তো আর একবার এই গল্প হয়েছিল। মা ও বুবুতে।

মা বাবু কি আর ভাল হবে না?

বুবু কিছু বলেন না। এ উত্তর তার জানা নেই।

অফিসফেরত আব্বা এ খবরে কি করবেন বুঝতে পারেন না। রজবআলী খালু এল নানা প্রকার ঝাঁড়ফুঁকের জন্য। পানিপড়া সুতোপড়া গলায় ঝোলানো হল। মা কোথা থেকে যেন একথোক টাকা আব্বাকে দিয়ে বলে– যেমন করে হোক। বাঁচাতেই হবে। আব্বা কবিতা লেখা বাদ দিয়ে সারারাত বারান্দায় ঘুরলেন। পায়চারি যাকে বলে।

মিঠুপা রান্নাঘরের দায়িত্ব নিলেন। পড়াশুনা পরীক্ষা এখন আর কোন ব্যাপার নয়।

তারপর এ বাড়ির সকলের উদ্বেগ, দোয়া, তাবিজ, প্রার্থনা সব কিছু উপেক্ষা করে তেরদিন দশঘণ্টা পরে ও চলে গেল– বোধকরি যেখান থেকে ও এসেছিল, সেখানেই। কাজল জানে যারা মারা যায় আকাশে তারা হয়ে ফোটে। পিয়াল কি তারা হবে। একটুখানি তারা। ভোরে ঘুম ভেঙেই এ খবর জেনেছিল ও। যেমন সে জেনেছিল ওর জন্মের খবর। নাম নিয়ে ঝগড়া শেষ। সেদিন এক বাজে রোববারের সকাল।

আব্বার অফিস নেই। মায়ের কথা ছিল অনেককিছু রান্না করবার। মমতাদের বাগানে পিকনিকের সব বন্দোবস্ত তৈরি হয়েছিল। ইটের চুলো আর ছোট ছোট কাঠ। ছোট এলুমিনিয়ামের পাতিল।

আব্বার বুকে মুখ রেখে বুবু কাঁদছেন। মিঠুপা ঠন ঠন করে রান্নাঘরে রাঁধতে রাঁধতে চোখ মুছছে। নাক টানছে।

এই সব কিছু থেকে দূরে সেই চেনা কালভার্টে গিয়ে বসে কাজল। নিচে সেই খাল। মেঘের ডাকে যেখান থেকে কৈ মাছ উঠে রাস্তা দিয়ে হাঁটে। আর একরাতে বালতি বালতি মাছ ধরেছিল মমতার বাবা ও আব্বা মিলে। আজো তির তির বয়ে চলেছে স্রোত। আর মাথার উপরে সেই কদমগাছ। একদিন যে গাছের বিষ্টি ওকে মন খারাপ করিয়েছিল কারণবিহীনভাবে। ওর মনে হয়েছিল এইসব বিষ্টিরা অনেকদূরের কোন দেশ থেকে চলে আসে। সে দেশে কেবল আনন্দ নয়, বিষাদও থাকে। এমনি কোন বোঝা না-বোঝা অনুভব। অদূরে বেড়ালমাসির বাড়ি। অনেকগুলো বেড়াল ঘুরছে বাগানে। সেই স্রোত, সেই কদমগাছ, বেড়ালমাসির বেড়াল আর সেই পচা হুঁ হুঁ হাওয়া– হঠাৎ ও জোরে কেঁদে ওঠে। যেন ওর বুকটা ভেঙে যাবে এমনি কোন কষ্ট। এমন রেশমনরম চুল, মিষ্টি নাক, আর পাখির মত মানুষটি কেন চলে গেল। কেন চলে যায় কিছু মানুষ। কেন এমন করে ভেঙে যায় বুক।

কাজল। পিঠে যার হাত তিনি পান্না। বলেন– কাঁদে না কাজল। এত কাঁদে না।

ওর মনে হয় একা কাঁদা যায়। কিন্তু কেউ যদি এই সময় ভালবেসে পিঠে হাত রাখে ভাল লাগে। কাজল তবু অনেকক্ষণ ধরে কাঁদে। তারপর মুখ তোলে। পান্না পাশে এসে বসেছে। জলস্রোত হঠাৎ গতি থামিয়ে দিয়ে শুনছে কাজলের কান্না। –সত্যি ভীষণ ভয়ানক এ ঘটনা রে কাজল।

কাজল আবার ডুকরে উঠতে চায়। পান্না তাকে বলে– আর কাঁদিস না। তোর মিঠুপাও কাঁদছে তাই না?

এত দুঃখের ভেতর কাজলের মনে হল ও প্রশ্ন করে– বাড়িতে সবাই যদি কাঁদে মিঠুপা কেন কাঁদবে না। কিন্তু কিছু বলে না। তবু মিঠুপা এক একসময় দুঃখকে ভেতরে রেখে দিতে জানে। কাজল পারে না।

ওরা বাড়িতে এল যদি কোন কাজে লাগে তাই।

আর নানা কাজের ভেতর দিয়ে নিঃশব্দ মিঠুপা ও পান্না অনেকসময় এত কাছাকাছি হল, আরেকটু হলেই দু'জনের মাথা ঠুকে যেত। ওরা কোনসময় কথাও বলল। ভলানটারি ওয়ার্কে মিঠুপার এই কাছে আসাই বোধকরি পান্নার পুরস্কার। কিন্তু ও কোন পুরস্কারের আশায় কাছে আসেনি। তবু একদিন এই কাছে আসা হয়তো স্মৃতি হবে তা কাজল জানে। এর বেশি কিছু নয় তাও কাজলের জানা। কিংবা এখনো অনেককিছু কাজল জানে না, যদিও ও মনে করে জানে।

মিঠুপা সকলের জন্য চা করে ট্রেতে করে জনে জনে পৌঁছে দিল। সে রাতে খাবার এল পান্নাদের বাড়ি থেকে। এ বাড়িতে আজ চুলো জ্বলবে না। বুবু ঝিম ধরে পড়ে রইলেন। রীণু ও বিনু ফুঁপিয়ে কাঁদল অনেকক্ষণ। আর চুমকি বলল– আমার ভাইয়া কোথায়?

• পরবর্তী সংখ্যায়

সালেহা চৌধুরী
প্রবাসী কথাসাহিত্যিক

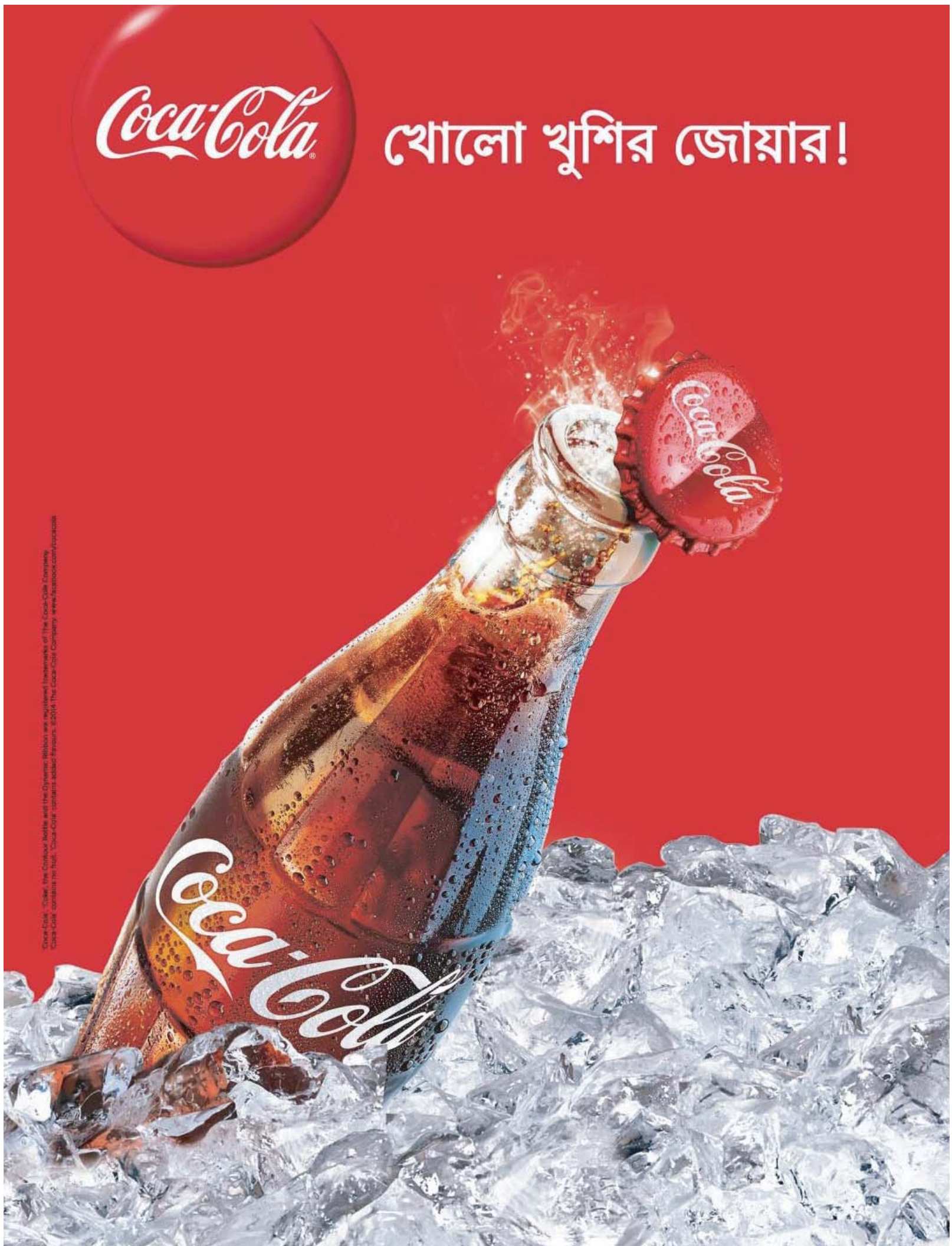
Coca-Cola
খোলো খুশির জোয়ার!
Coca-Cola
Coca-Cola
Coca-Cola, Coke, the Contour Bottle and the Dynamic Ribbon are registered trademarks of The Coca-Cola Company.
Coca-Cola contains no fruit. Coca-Cola contains added flavours. ©2014 The Coca-Cola Company www.facebook.com/cocacola

ছোটগল্প

প্রতীক্ষা

তৃপ্তি বালা

লুকাদির কথা মনে পড়ে! কত সহজ-সরল ছিলেন লুকাদি। আমার শৈশব জীবনের এক নিপুণ গল্পকার তিনি। কত যে রঙ্গ-রস আর গালভরা উপমায় উপস্থাপন করতে পারতেন সব গল্প! শিশু-কিশোর মনকে মাতিয়ে দিতেন, রহস্য-স্বপ্নজাল রচনা করতেন; নিজেও তিনি মজে যেতেন তার গল্পের মধ্যে। সেই লুকাদি, মনে করবার চেষ্টা করি আজ– তিনি হুবহু দেখতে কেমন ছিলেন। শরীরটা লুকাদির ভারী-ই ছিল। উচ্চতায় যেন মাঝারিও নয়, তারচে একটুখানি খাঁটোই ছিলেন। গায়ের রঙটি ছিল শ্যামবর্ণ, তবে মুখের রঙ ছিল যেন ফরসারই দিকে। মুখম-লটি ডিম্বাকৃতি। ভ্রূদুটো খানিকটা যেন জোড়া– ঘন। চোখ দুটো ভাসা-ভাসা, মাঝারির চাইতে খানিকটা বড়। আর সে চোখের পলস্নব ছিল ঘন কালো নিবিড় আর দীর্ঘ। জোড়া-ঘন ভ্রূ আর চোখ দুটিই ছিল লুকাদির মুখাবয়বের প্রধান বৈশিষ্ট্য। লুকাদির নাকটি মোটা এবং ঠোঁট দুটোও তাই। মাথার চুলগুলো ঘন কালো দীর্ঘ এবং ঢেউ তোলা। আমার কাছে মনে হয়– সব মিলিয়ে লুকাদি আকর্ষণীয়ই ছিলেন। তবে সৌন্দর্যের মাপকাঠিতে আজকের বিচারে হয়তো দেহাবরণের কারণে তিনি মার খেয়েই যেতেন। আমার শৈশবের এক জ্বলজ্বলে নক্ষত্র তিনি। এই মানুষটি আমার শৈশবকে অনেকখানিই ভরিয়ে তুলেছিলেন।

রোববার বন্ধের দিনে সকাল থেকেই মনটা উদগ্রীব থাকত কখন পড়াশুনায় কোন রকম একটা ইতি টেনে লুকাদিদের বাড়িতে যাব। দশটা সাড়ে দশটার মধ্যে প্রাতঃকালীন আহার আর হোমওয়ার্কের একপ্রকার সমাপ্তি ঘটিয়ে সুযোগ বুঝে এক ফাঁকে তেঁতুল তলার ফাঁক দিয়ে দৌড়ে গিয়ে উঠতাম লুকাদিদের উঠোনে। শীতের সকালে জলচৌকিতে বসে তখন গরম রোদের কোমল পরশ গায়ে নিচ্ছেন

আমাদের বাড়ির লাগোয়া বাড়িটিতেই ভাড়া থাকতেন লুকাদিরা। ছোট্ট এক ব্রিটিশ মডেলের দোতলা বাড়ি– যার সিমেন্টবালুসুরকির প্লায় সমস্তটাই ঝরে গিয়ে শুধু ইটের হাড়জিরজিরে গাঁথুনিটাই দাঁড়িয়ে ছিল– সেইরকম এক বাড়ির নীচের তলার দুটি রুম নিয়ে থাকতেন লুকাদিরা। বাবা একজন রিটায়ার্ড স্কুল মাস্টার, দাদা বিএ পরীক্ষা শেষ করে টিউশনি খুঁজে নিয়েছেন, আর এক দিদি সন্ধ্যা– এ ক'জন নিয়েই লুকাদিদের সংসার। খুব ছোট্ট বেলায় মাকে হারিয়েছিলেন লুকাদি। মায়ের বিষয়ে তাঁকে কোনদিন তেমন করে বলতে শুনিনি– মানে তাঁর মা দেখতে কেমন ছিলেন, কেমন পাড়ের শাড়ি পরতেন তিনি, তাঁকে কতখানি আদর করতেন– এসব মনে হয় লুকাদিকে কখনও বলতে শুনিনি। আমরা তো তাঁদের সংসারে মায়ের উপস্থিতি দেখতে পাইনি, ধরেই নিয়েছিলাম মা ছাড়াই লুকাদিদের সংসার। এ বিষয়ে মনে হয় তাঁর কাছে কখনও জানতে চাওয়াও হয়নি। আজ মনে হয়– খুব শৈশবেই মাকে হারিয়েছিলেন লুকাদি– যে বয়সে স্মৃতিতে কিছুই ছাপ ফেলে যায় না। এমনও হতে পারে যে, লুকাদিকে জন্ম দিতে গিয়েই তাঁর মায়ের মৃত্যু হয়েছে, বেঁচে গেছে কেবল নবজাতক শিশুটি– ধীরে ধীরে বেড়ে উঠেছে। এক সময় পরিণত হয়েছে বুঝদার পূর্ণ নারীতে পরিণত হয়েছেন আমাদের লুকাদি।

রোববার বন্ধের দিনে সকাল থেকেই মনটা উদগ্রীব থাকত কখন পড়াশুনায় কোন রকম একটা ইতি টেনে লুকাদিদের বাড়িতে যাব। দশটা সাড়ে দশটার মধ্যে প্রাতঃকালীন আহার আর হোমওয়ার্কের একপ্রকার সমাপ্তি ঘটিয়ে সুযোগ বুঝে এক ফাঁকে তেঁতুল তলার ফাঁক দিয়ে দৌড়ে গিয়ে উঠতাম লুকাদিদের উঠোনে। শীতের সকালে জলচৌকিতে বসে তখন গরম রোদের কোমল পরশ গায়ে নিচ্ছেন লুকাদি। আমাকে দেখে অদ্ভুত স্নেহমাখা হাসিতে ভরে গেছে তাঁর মুখ– 'এসে গেছ সোনা?' মধুর হাসিতে আমিও গিয়ে বসেছি জলচৌকিতেই– লুকাদির গাঁ ঘেঁষে। উঠে গিয়ে তখন আরেকটি চৌকি ঘর থেকে বের করে নিয়ে এসেছেন লুকাদি। ততক্ষণে ওর বাবাও ব্যাগ হাতে বাজার নিয়ে ফিরেছেন। আমার কাছে আমাদের সবার বিষয়ে খানিক তত্ত্বতালাশের পর তাঁর সময় হয়ে যেত রান্না ঘরে গিয়ে ঢোকার। সন্ধ্যাদি নয়তো লুকাদি পালা করে ঘরের কাজ আর রান্নাবাড়া করতেন। একটা সময়ে সন্ধ্যাদির বিয়ে হয়ে যাবার পর বাবা এবং এক দাদাকে নিয়েই ছিল লুকাদির সংসার। সন্ধ্যাদি দেখতে এক কথায় সুন্দরী। মাঝারি গড়নের ছিলেন তিনি। যথাসময়ে সম্বন্ধ এসে ঠিকঠাক বিয়েও হয়ে যায় তাঁর আরেক শহরের এক স্কুল মাস্টারের সঙ্গে। আমার খুব মনে পড়ে– সন্ধ্যাদির গায়ের রঙটি ছিল একেবারে যেন কাঁচা হলদে রঙের। চুলগুলো ছিল মশকালো আর একেবারে হাঁটুরও নীচে গিয়ে নেমেছিল সেই মেঘবরণ ঢাল। খুব বেশি সময় লাগেনি কথা, পাকা দেখা, একটা ভাল লগ্ন দেখে দিনতারিখ ঠিক হয়ে মনে হয় হঠাৎই একদিন বিয়ে হয়ে গেল সন্ধ্যাদির।

এরপর থেকেই লুকাদি একা। ওর সার্বক্ষণিকের সঙ্গী, দুঃখসুখের ভাগীদার– মাহীন সংসারে এতদিনকার যে সম্পর্ক দুই সহোদরার মাঝে গড়ে উঠেছিল, হঠাৎই সেই বিচ্ছেদ-বেদনার ভার কীভাবে যে বহন করেছিলেন লুকাদি তা উপলব্ধির বোধ আমার তখনও আসেনি। আমি শুধুই তাঁকে দেখতে চেয়েছি হাস্যোজ্জ্বল, অমলিন আর আমার প্রতি তাঁর সাদর আহ্বান। পেয়েওছি– যতদূর মনে পড়ে খুব কমই আমার আহ্বানে সাড়া না দিয়ে থেকেছেন তিনি। রান্নার কড়া চাপিয়ে সরষের তেল ঢেলেছেন তাতে, ভাতের হাড়ির মাড় গালতে গালতে একের পর এক গল্প করে গেছেন আমার সঙ্গে। 'ঐ জায়গাটা কী হল আবার বল না লুকাদি।' 'পাজি মেয়েকে নিয়ে তো পারি না! এক গল্প ক'দিন শুনতে হয়। এই দেখ্ ভাজিতে পোড়া লেগে গেছে তোর সাথে গল্প করতে যেয়ে।' বলেই আবার হেসে উঠেছেন লুকাদি। আবারও শুরু করেছেন– কাল বিকেলে *জীবন থেকে নেয়া* যে ছবিটা দেখে এসেছেন তারই গল্প। গল্পের শুরুটা হুবহুই যেভাবে পর্দায় দেখে এসেছেন– সেভাবেই শুরু করতেন লুকাদি। তারপর একে একে দৃশ্যের পর দৃশ্য ভেসে উঠেছে তাঁর চোখের তারায়, মুখের দীপ্তিতে। প্রেমিক-প্রেমিকার প্রথম সাক্ষাতের মুহূর্তটির বর্ণনায় লুকাদির অন্তর পলবিত হয়ে দু'চোখ ভাসিয়ে মুখে উপচে পড়ত হৃদয়মনের ভাললাগার যত রোমাঞ্চগীতি! আবেগের এক পর্যায়ে হঠাৎই কেমন থেমে যেতেন তিনি। 'এই নারে এসব কথা তোকে বলছি কেন? বুলু জানতে পারলে আমাকে একেবারে মেরেই ফেলবে।' কিংবা পাশের ঘরে একবার উঁকি দিয়ে দেখে আসতেন বাবা কিংবা দাদা কান খাড়া করে আছেন কিনা?

ভাত রান্না শেষ, পাতাকপির ডালনাও। এরপর লোহার কড়াতে বজরিট ফ্যাংরাগুলো হলুদলবণে মেখে নিয়ে হাল্কা ভাজি করে নেন লুকাদি। পিঁয়াজ, আলু, বেগুনকুচি, কাঁচা মরিচ ফালি, হলুদজিরা বাটা সবকিছু তৈরি করে নেবার পর চাপিয়ে দেবেন চচ্চড়ি। শেষ সময়ে কয়েকটা কাঁচা ধনেপাতার কুচি ছেড়ে দেবেন তিনি এবং ছোট্ট একটুখানি বাটিতে করে আমার সামনে ধরবেন– লবণঝাল ঠিক হয়েছে কিনা, কিংবা কেমন হয়েছে স্বাদ? আলু-বেগুন-পিঁয়াজধ নেপাতায় বজরিট ফ্যাংরার চচ্চড়ি চেখে দেখার মত আগ্রহ আমার তখনও জন্মেনি। মিষ্টি কিংবা মিষ্টান্নজাতীয় খাবার হলে এক কথা, মায়ের হাতে রান্না মিষ্টান্ন বাটিতে বাটিতে ঢেলে রাখার পর পিতলের সেই খির মাখানো কড়াটাতেই আমার তখনকার আগ্রহ সীমাবদ্ধ। ভাতের সঙ্গে খাবার ঝাল তরকারি কুমড়াপুঁইশাকের সবজি নিরামিষ কিংবা বজরিট ফ্যাংরার বিষয়ে আমি তখনও উন্নাসিক। সুতরাং যা হত বাটিটি ফিরিয়ে নিয়ে লুকাদিকেই তা চেখে দেখতে হত। তার মুখভঙ্গী দেখে বুঝে নিতাম রান্নাটা দিদির ফার্স্টক্লাস হয়েছে।

লুকাদির কাছে সিনেমার পরিণত গল্পগুলোর প্রতিই

আমার যত আগ্রহ উৎকণ্ঠা ছিল। আমার তো তখন শৈশব-কৈশোরের সন্ধিক্ষণ। ঠাকুরমার ঝুলি, ঈশপের গল্প, তুষার কন্যা সাত বামুনের মত গল্পগুলো তখন শুনেছি এবং বাসাতে আনা বইগুলো থেকে কিছু পড়েও ফেলেছি। তো এই প্রাক্‌কৈশোরে এসে জীবের জৈব রসায়নের প্রতি হয়তো একটা ভালই আগ্রহ জন্মে গিয়েছিল ভিতরটায়। আমাদের বাড়ির সামনের মাঠে বিকেলে খেলতে খেলতেই দেখতে পেতাম লুকাদি সাজগোজ করে হাতে তাঁর ছোট্ট পার্সটি নিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন রাস্তা দিয়ে। বুঝে যেতাম আরেক বান্ধবীকে সঙ্গে করে তিনি শেষে অরোরা টকিজেই ঢুকে পড়বেন বাংলা সিনেমার এক বিশাল পর্দার সামনে। হলে একটা নতুন ছবির পোস্টার টানা হলেই লুকাদি অস্থির হয়ে উঠতেন। চূড়ান্ত প্রেমের পরাকাষ্ঠার নিদর্শন ছবিগুলো– *অশ্রু দিয়ে লেখা, সুজন সখী* একবার দেখেই হত না তাঁর। আর কি নিখুঁত তার বর্ণনা। সুযোগ বুঝে আমিও পাকড়াও করতাম তাঁকে। আমাদের বাড়ির পেছনে পুকুর পাড়ের ধার ঘেঁষে যে তালগাছগুলো– তারই গোড়াতে গিয়ে বসতাম আমরা। দুপুরের খাবার শেষে বিছানায় মায়ের সঙ্গে জোর-জবরদস্তি ঘুমের খানিক মহড়া দিয়ে হঠাৎই এক ফাঁকে পা টিপে টিপে বের হয়ে যেতাম বাড়ি থেকে। লুকাদি হয়তো তখন মাত্রই খাবার শেষ করে কলতলাতে বাসন মাজতে গিয়েছেন।

ভাঙা বাড়ির পলেস্তরাখসা ই টের গাঁথুনির মতই খানিক দূরে সিমেন্টে শ্যাওলা ধরা এক ছোট্ট বাথরুম গোছের জায়গাও ছিল দিদিদের। আর সেই চুয়াত্তরপঁচা ত্তর সালের দিকে টাইম কলের টলটলে জলও তখন কল দিয়ে বেরোত। যদি জল না থাকত, বাসন-কোসন নিয়ে সেই তালতলার পুকুরপাড়েই আসতে হত দিদিকে। আমাদের বাড়ির পিছনের ঐ পুকুরপাড়ে দুটো বরই গাছও ছিল। আর কি অদ্ভুত হলদেলাল বরই য়ে ছেয়ে থাকত শীতের সেই গাছ দুটো! মনে হয় মার্চএপ্রিল মাস পর্যন্তও আমরা সে ররইতে সাধ মেটাতাম। ইট ছুঁড়ে থোকা থোকা হলদে বরইগুলো পুকুরপাড়ে ঘাটলার ধারে নামিয়ে আনতাম। আবার কখনও পুকুরপাড় দিয়ে হেঁটে যাওয়া পাতাকুড়োনীকে বলেক য়ে গাছে উঠিয়ে জায়গা মত ডালে দুটো ঝাঁকুনি দিতে কাকুতি-মিনতি করতাম। লুকাদির আঁচল আর আমার ফ্রকের মত বিস্তৃত জায়গাতে অনায়াসেই ধরে যেত অজস্র বরই। বাসাতে বন্ধের দিনে ঘটা করে স্নানের আগে আগে লোক উঠিয়ে মৌসুমী ফল হিসেবে এই বরই পাড়া হত। টক-মিষ্টিগুলো নিমেষেই শেষ করে বাকিগুলো কাঁচামরিচ, ধনেপাতা, লবণে পাটায় ছেঁচেও রসাস্বাদন করা হত ধীরে ধীরে। এ ব্যাপারে লুকাদির জুড়ি ছিল না।

টক যে দিদি কত খেতে পারতেন! কবরীশাবানার মত হিট তারকাদেরকে নকল করে দেখাতেন– কিভাবে পর্দায় তারা টকআচার খেয়ে থাকেন। আমাদের বাড়ির মামা-কাকারা সুযোগ বুঝে লুকাদির সঙ্গে ভালই রঙ্গরসিকতা করতেন। লুকাদির হাতে ছেঁচা বরই মাখাতে তাঁরাও ভাগ বসাতেন। মনে পড়ে লুকাদিকে তাঁরা নানা চটুল কথায় ভোলাতেও চাইতেন। আটপৌরে ধাঁচে পড়া শাড়িটি তখন সযতনে বুকের কাছটাতে বার বার গুছিয়ে নিতেন লুকাদি। কেমন লজ্জাবনত রাঙা হয়ে উঠত তাঁর মুখখানি তখন! একটা বিষয় ঐ সময়েই খেয়াল করেছি– লুকাদির প্রতি আমার মামাকাকা দের তেমন মর্যাদা কিংবা ভালবাসার বোধ নেই। তাঁর প্রতি কোন প্রকার দরদও বোধ করেন না তাঁরা। এমনও শুনেছি– লুকাদিকে নিয়ে তারা পরোক্ষে নানা অশোভন উক্তিও করছেন। সহজেই আপন হয়ে যেতে পারতেন যে মানুষটি তার প্রতিই বুঝি ছিল তাদের যত অবজ্ঞা! অথচ কী অদ্ভুতভাবে দেখতাম– লুকাদি ঐ পুরুষ মানুষগুলোর মনোভঙ্গী কিংবা মনোবৈকল্যের খবরই রাখতেন না। নিজের জগতে নিজের মধ্যেই তিনি বিচরণ করতেন; স্বপ্নজাল তৈরি করে যেতেন তিনি কত, আর আমাদেরকেও যেন তার কৃপালোক বর্ষণ করতেন।

গ্রীষ্মের একঘেয়ে দীর্ঘ ক্লান্ত মধ্যাহ্নে লুকাদির জানালায় উঁকি দিয়ে কতদিন যে তাঁকে বিছানা থেকে তুলে এনেছি আমি! নিস্তব্ধ দুপুরে দৈত্যের মত ঝাপটানো বকুলদিদের বিশাল তেঁতুলতলার নীচ দিয়ে গিয়ে বসেছি পুকুরপাড়ের সেই বরই গাছ দুটো পেরিয়ে খাড়া তাল গাছেরই গোড়ায়। সেখানে বসে আধশোয়া হয়ে গল্প করা লুকাদির ভারী পছন্দের ছিল। আর আমি তার একমাত্র মুগ্ধ শ্রোতা। ঘরে দিদিকে ফাঁকি দিয়ে লুকাদির থেকে তখন যত রসাস্বাদন করে নিতে পারি আমি! রাজ্জাক কাহিনির কোন পর্যায়ে কবরীর পানে আড়নয়নে তাকিয়েছিল কিংবা ওদের প্রথম দর্শনে চার চোখের ভাব বিনিময় কিরকম ছিল– হুবহু তা নিজের চোখেই বুঝিয়ে দিতেন লুকাদি। রোমান্সের বিশেষ মুহূর্তগুলোতে কিংবা নাচের দৃশ্যের অবিকল দৃশ্যপট রচনা করতেন তিনি। আঁচল তুলে নিয়ে তেজি এক গ্রাম্য মেয়ের মতই পেছন দিক দিয়ে পেঁচিয়ে আনতেন শাড়ি– সে এক অভিনব ব্যাপার! আমার শৈশব-পেরোনো প্রাক্‌কৈশোরে নারীপুরুষের মিলনবিরহে অনেকখানিই পেকে উঠেছিলাম আমি। মাঝে মাঝে নিজের সে প্রমাণ দিতে গিয়ে বাসাতে দিদির কাছে ধরাও খেয়েছি কত। মনের আনন্দে খানিক বলতে গেছি যখন দিদির কাছে– আমার ইদানীংকালের জ্ঞানসমৃদ্ধির কথা, সুযোগ বুঝে দিদিও দিয়েছেন ডেকে এক ঝাড়ি লুকাদিকে। পুকুরপাড়ে একক এক শিল্পীর অভিনীত মঞ্চপালা দর্শন তারপর থেকেই আমার জন্যে অনেকখানিই দুরূহ হয়ে ওঠে।

এই লুকাদি হঠাৎই কেমন বদলে যেতে থাকেন। হঠাৎই একদিন পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী হন বাবা। মাছের খালৈ হাতে মেসোমশাইকে আর সকালে বাজার থেকে ফিরতে দেখা যায় না। পানুদাই তারপর থেকে কাজটি করেন। আর মেসোমশাইকে দেখি সারাটিক্ষণ কেমন বিছানায় শুয়ে উদ্দেশ্যহীন, বোধহীন, নির্বাক চোখে তাকিয়ে থাকেন। এখন আর তিনি নিজে থেকে উঠে গিয়ে কিছু করেন না। পানুদা, লুকাদি, কখনও স্বামীর বাড়ি থেকে

আমাদের বাড়ির মামা-কাকারা সুযোগ বুঝে লুকাদির সঙ্গে ভালই রঙ্গ-রসিকতা করতেন। লুকাদির হাতে ছেঁচা বরই মাখাতে তাঁরাও ভাগ বসাতেন। মনে পড়ে লুকাদিকে তাঁরা নানা চটুল কথায় ভোলাতেও চাইতেন। আটপৌরে ধাঁচে পড়া শাড়িটি তখন সযতনে বুকের কাছটাতে বার বার গুছিয়ে নিতেন লুকাদি। কেমন লজ্জাবনত রাঙা হয়ে উঠত তাঁর মুখখানি তখন! একটা বিষয় ঐ সময়েই খেয়াল করেছি– লুকাদির প্রতি আমার মামা-কাকাদের তেমন মর্যাদা কিংবা ভালবাসার বোধ নেই।

লুকাদিকে দেখি, মেসোমশাইকে ধরে পিছনদিকটাতে ওর একহাতে সাপোর্ট রেখে তুলে বসিয়েছেন, তারপর আরেক হাতে খাটের নীচ থেকে পিকদানিটা তুলে এনে তার মুখের সামনে ধরেছেন। মেসোমশাই শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে বুকের যত কফ ঝেড়ে মুছে ফেলছেন পিকদানিতে। দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া আমি আর কিছুই করে উঠতে পারি না। হাত দিয়ে এক সময় আলনার দিকে লক্ষ্য করে আমায় ইঙ্গিত করলে বুঝতে পারি গামছাটি চাইছেন লুকাদি।

এসে সন্ধ্যাদি ধরে ধরে তাঁর সবকিছু করে দেন। লুকাদির দিনরাত্রির সব ক্ষণগুলো তখন থেকে ঐ এক চক্রের মাঝেই আটকে যায়। ছোট্ট অবোধ শিশুকে নিয়ে এক স্নেহময়ী জননীর অহর্নিশ যেমন চলে নিত্যদিনের সংগ্রাম। সময়ের সঙ্গে এখন সারাটাক্ষণই পালস্না দিয়ে ছোটেন আমার লুকাদি। আমাকে দেখে আর সেই মধুর হাসিটি তিনি হাসেন না। কেমন একটুখানি কেবল হাসির রেখা টেনে আনেন ঠোঁটের কোণে যেন কত কষ্টে! আমার মন তাতে ক্ষুণ্ণ হয়। আমার দিকে আর যেন কোন লক্ষ্যই নেই লুকাদির! দিনের পর দিন সকাল এবং বিকেলে সময়মত তার সামনে গিয়েও আমি তার মনোযোগ কাড়তে পারি না। আমি যে ছিলাম তার দৈনন্দিন জীবনের এক প্রাণধারা, আজ হঠাৎ কেমন করে দূরে কোথায়– কোন সে অসীম দূরত্বে তিনি আমায় নিক্ষেপ করলেন– জানি না। দিদিকেও বাড়িতে ফিরে কিছু বলে উঠতে পারি না। আমি তার দিকে সহজভাবে তাকাতেও ইচ্ছে করি না। আমি তো জেনে গেছি লুকাদিকে ডেকে আমার দিদি একদিন কত বকে দিয়েছেন যেন তিনি আমাকে আর ইঁচড়েপাকা বানিয়ে তোলার বিষয়ে প্ররোচিত না করেন। তবু আমি এও বুঝে গেছি, আর কিছু নয়, মেসোমশায়ের অসুস্থতাই লুকাদিকে অমন বোধহীন এক বিমর্ষ মানবীতে পরিণত করেছে, বার বার আমার আহ্বানকে যে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ফিরিয়ে দিতে পারে আজকাল!

'লুকাদি তুমি কেন আমাকে দেখে খুশি হও না আর?'– এ প্রশ্ন আমি তাঁকে করেছি একদিন। উত্তর দেননি লুকাদি। আমি নাছোড়বান্দা, আবারও জানতে চেয়েছি তাঁর কাছে ঐ একই প্রশ্ন। এবারে উত্তর করেছেন তিনি। বলেছেন, 'তুই কি কোনদিন বড় হবি না দিপু?' 'কেন তোমার চোখে মনে হয় না যে আমি বড় হয়েছি?'

এবারেই কেবল যা একটু হাসতে দেখি লুকাদিকে। অনেকটা যেন আগেরই ধরনে বলেন, 'আহারে মস্ত বড় হয়েছ। কথাবার্তায় তো মনে হয় না। শুধু মাথায় লম্বা হলেই বড় হয় না, বুদ্ধিতেও বাড়তে হয়!'

লুকাদি আমাকে অপমান করছেন?– আমি চুপ করে যাই খানিকক্ষণ। তারপর আবার বলি, 'কেন আমার বুদ্ধি হয়নি তুমি বলতে চাও?'

'বুদ্ধি যদি হবে তাহলে বুঝিস না আমার মন খারাপ?'

'তোমার মন খারাপ, কেন লুকাদি? আমি কি তোমার মন ভাল করে দিতে পারি না?'

'পার, খুব পার, মন আরো খারাপ করে দিতে পার!'

'আমি তোমার মন খারাপ করে দেই!' অবাক বিস্ময়ে আমি তাকাই লুকাদির দিকে।

লুকাদি তখন দৌড়ে ছুট দেয় ঘরের দিকে– মেসোমশাই তার কী প্রয়োজনে গোঁ গোঁ শব্দ তুলছেন মুখ দিয়ে।

আমিও পায়ে পায়ে গিয়ে দাঁড়াই সেখানে। লুকাদিকে দেখি, মেসোমশাইকে ধরে পিছনদিকটাতে ওর একহাতে সাপোর্ট রেখে তুলে বসিয়েছেন, তারপর আরেক হাতে খাটের নীচ থেকে পিকদানিটা তুলে এনে তার মুখের সামনে ধরেছেন। মেসোমশাই শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে বুকের যত কফ ঝেড়ে মুছে ফেলছেন পিকদানিতে। দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া আমি আর কিছুই করে উঠতে পারি না। হাত দিয়ে এক সময় আলনার দিকে লক্ষ্য করে আমায় ইঙ্গিত করলে বুঝতে পারি গামছাটি চাইছেন লুকাদি। আমি কেবল ওটি এনে তার হাতে দিতে পারি। তারপর হয়তো এক গ্লাস জল ভরেও এনে দিতে পারি তার হাতে। তাই দিয়ে বাবাকে কুলি করিয়ে আবার তাঁকে পাশ ফিরিয়ে শুইয়ে দেন বিছানায়। আর লুকাদি তখন ঐ নোংরা পিকদানিটা নিয়ে এগিয়ে যান বাইরের উঠোন পেরিয়ে কলপাড়ের দিকে। আমি তখন তাকে আর বিরক্ত না করে ধীরপায়ে বাসাতে চলে আসি।

সারাটাক্ষণ নয়তো দিনের অনেকটা সময়ই আমার মনের মধ্যে কেবলই বেজে চলে, 'আমি লুকাদির মন খারাপ করে দেই!'

যাকে দেখলে আমার মন ভাল হয়ে যায়, যার সঙ্গে কথা বললে, মুখের ভাষায় উদ্ভাসে আমার মন ভাল হয়ে যায়, সেই আমি কিনা তার মন খারাপ করে দেই! মাথার মধ্যে বেশ কিছুদিনই বিষয়টি চেপে থাকে আর আমার মনটাকে দুর্বল করে দেয়।

একদিন স্কুল থেকে ফিরে দেখি– লুকাদি ঘাটে বসে বাসন মাজছেন। কাঁধের থেকে বইয়ের ব্যাগটি নামিয়ে নিঃশব্দে আমি পুকুরপাড়ের বরই গাছটির কাছে গিয়ে দাঁড়াই। লুকাদিকে দেখি বাঁহাতে আঁচল চেপে চোখের জল মুছছেন। আমি আরো এগিয়ে গিয়ে পায়ের ওপর ভর করে তাঁর পাশে গিয়ে বসি। আমাকে দেখে লুকাদি অবাক হন না। বোধহয় তিনি বুঝেই নিয়েছেন– আমি চলে এসেছি। অথচ আমি ভেবেছিলাম তিনি আমাকে দেখে অবাক হবেন, হঠাৎ চমকে যাবেন!

'স্কুল শেষ হল তোর?' লুকাদি জিজ্ঞেস করলেন।

'রোজই তো এই সময়ই শেষ হয়।' আমি বললাম। বিষয়টি তো জানেনও লুকাদি। তবু এ ছাড়া কি তাঁর মুখে আর কোন কথা জোগায়নি? নাকি কিছু বলার জন্যই বললেন। আমি তাকে ছাড়লাম না, জিজ্ঞেসই করে বসলাম, 'তোমার অনেক কষ্ট এখন, তাই না লুকাদি?' লুকাদি এবার একটুখানি হাসলেন। তাঁকে হাসাতে পেরে মনটা আমার খানিকটা ভাল হয়ে উঠল। উৎসাহ পেয়ে আবার বললাম, মেসোমশাইকে হাসপাতালে ভর্তি করাও না কেন? ভাল ডাক্তার দেখিয়ে চিকিৎসা করালে নিশ্চয়ই ভাল হয়ে উঠবেন মেসোমশাই।

লুকাদি এবার একভাবে আমার দিকে খানিক তাকিয়ে থাকেন। আমি ওর চোখের সে ভাষা মনে হয় ঠিক পড়ে উঠতে পারি না। তিনি কি আমার কথায় অবাক হচ্ছেন, খুশি হচ্ছেন, নাকি গবেট মুর্খই ভাবছেন আমাকে! বুঝতে পারি না আমি।

একসময় বাসন ধোয়া শেষ করে উঠে পড়েন লুকাদি। আমিও দাঁড়াই তার সঙ্গে সঙ্গে। লুকাদি বলেন, 'তোর অনেক বুদ্ধি হয়েছে দিপু, মন দিয়ে লেখাপড়া কর।'– ঐ এক কথা বলেই তিনি বাড়ির দিকে চলে যান। আমিও আর কোন কথা বলার সুযোগ না পেয়ে দাঁড়িয়ে থেকে তাঁর যাবার পথের দিকে তাকিয়ে থাকি। আমি তাঁর পিছনে পিছনে তাঁকে অনুসরণ করার সুযোগ পাই না। ততক্ষণে স্কুল থেকে ফিরে ভাত খেতে না বসার কারণে মায়ের চড়া গলা ভেসে আসছে বাতাসে।

পরের রোববার, ছুটির দিনে কী মনে করে সকালের নৈমিত্তিক পাট চুকিয়ে খানিক দৌড়ে খানিক পায়ে পায়ে গিয়ে ঢুকেছি লুকাদিদের রান্নাঘরে। বেলা খানিকটা এগিয়ে গেছে, নাকি একটু আগেভাগেই আজ রান্নাঘরে গিয়ে বসেছেন তিনি ঠিক বুঝতে পারি না। তবে উঠোনের চৌকিতে তাকে দেখতে না পেয়ে প্রথমেই পা চলে গেছে তাঁর রান্নাঘরের দিকে। প্রধান ঘরের দরজাটা সামান্য ভেজানো, তেমন কোন সাড়া শব্দও পাওয়া যায়নি সেদিক থেকে। সন্ধ্যাদি গতমাসে একবার এসে ঘুরে গেছেন স্বামীস্তান নিয়ে। সন্তোষদা চলে যাবার পরও দিনসাতেক বেশি থেকে গেছেন সন্ধ্যাদি। ছোট্ট শিশুকে নিয়ে শয্যাশায়ী পিতার এই নিরাভরণ গৃহকোণে স্মৃতিবিস্মৃতির ধূলিধূসরিত প্রাঙ্গণে আর কতদিনই বা থাকা চলে তাঁর। সময় বাস্তবতার কঠিন শৃঙ্খলে আটকে পড়া নারী জীবনের সেই সহজ সত্যকে মেনে নিয়ে তাড়াতাড়িই তাঁকে ফিরে যেতে

স্কুলে বড় ক্লাসে উঠেছি, পড়াশুনার চাপ বেড়েছে। বাসাতে গৃহশিক্ষকের কাছে তালিম শুরু হয়েছে। তখন আর আমার সেই সময় কোথায়? পড়াশুনো করে বড় হয়ে জীবনের অপূর্ণতাগুলোকে ঘোঁচাতে হয়– এইটেই আপাতত মাথায় করে নিয়েছি। মায়ের অপূর্ণতা, বাবার ইচ্ছে-আকাঙ্ক্ষাগুলোর সামান্যতম পূর্ণতাও যদি ঘটাতে পারি– তাতেই আমার আজকের সার্থকতা।

হয় স্বামীসংসা রে। আজকাল মনে হয় সন্ধ্যাদিটাও কেমন পাল্টে গেছেন। লুকাদির মনের কষ্ট উপলব্ধির সময় তাঁর আর নেই। কেমন শুধু নিজের সন্তানকে নিয়েই তিনি ব্যস্ত। আর সুযোগ পেলেই সন্তোষদার প্রসঙ্গ এনে সুখী এক দাম্পত্যজীবনের চিত্র তুলে ধরতেই তিনি পছন্দ করেন। লুকাদি কাজবাজ সেরে একটু ফুরসত পেলেই মাসির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে যান। বাবু বাবু বলে সদানন্দ সৌমিককে গাল টিপে টিপে আদর করেন। পরক্ষণেই আবার নিজের পড়ে থাকা কাজের কথা স্মরণ করেই দিদির কোলে ছেলেকে দিয়ে ছোটেন রান্নাঘরে। মনে হয় সন্ধ্যাদি আসায় বাড়তি খানিকটা চাপও পড়ে যায় তখন এই পরিবারের ওপর। পানুদাকে তো এখন বাড়িতে প্রায় পাওয়াই যায় না। তিন বেলা খাবার আর রাতে খানিক বিশ্রাম নিতেই শুধু তিনি বাড়িতে আসেন। চাকরির বাজারে পানুদা কোনদিন চেষ্টা করেছেন কিনা জানি না, ত বে মনে হয় আজ আর সে সুযোগও তাঁর নেই। সময় নষ্ট করার মত সময় পানুদার হাতে আর নেই। তিনি সকালস ন্ধ্যা, পারলে রাতেরও কিছু অংশ মানুষের বাড়িতে গিয়ে ছাত্র পড়ান। মেসোমশাই এই জেলা শহরের হাই স্কুলের একজন শিক্ষক ছিলেন। রিটায়ারমেন্টের পর বছরকয়েকের মধ্যেই তো তিনি শয্যা নেন।

রান্নাঘরে গিয়ে দেখি লুকাদি আজ ভাত শেষ করে ডাল চাপিয়েছেন কেরোসিনের চুলাতে। তারপর বটিতে কুচো করে কাটতে শুরু করেছেন কলাই শাক। আজ তিনি কলাই শাকের ঘণ্ট করবেন। ভাতের সঙ্গে ক'টা আলু সিদ্ধও দিয়েছেন তিনি। গতদিনের সাতলানো টাকি মাছের ক'টা মাথা শাকের মধ্যে দিয়ে ভালমত নেড়ে-চেড়ে কাঁচামরিচ ফালি দিয়ে রান্না শেষ করছেন তিনি। আজকের মত তাঁর রান্না শেষ।

'আজ আর কোন মাছ রান্না করবে না লুকাদি?'

'রোজ রোজ মাছ খাওয়া ভাল না, জানিস তো। শীতের দিনে কত শাকসবজি পাওয়া যায়। মাছ খেয়ে কি হবে?'

আমি তার দিকে খানিকটা বিস্ময় নিয়ে তাকাই। 'তুমি না মাছ ছাড়া খেতে পার না?'

লুকাদি একটু হাসেন। মনে হয় তাঁর এই হাসির মানে আজ আমি বুঝতে পারি। তাঁর ঐ হাসির মাঝে কেমন একটুখানি যেন কৌতুক লুকিয়ে আছে। কেমন যেন, আবার যেন ঠিক কৌতুকও নয়। মনে হয় যেন একটুখানি কেমন কষ্টও লুকিয়ে আছে, অনেকটা কষ্ট করেই তিনি হাসবার চেষ্টা করছেন কিংবা যেন আমার কথায় পাল্টা এক প্রকার বিদ্রূপই ছুঁড়ে দিয়েছেন। সত্যিই কি আর তার সে হাসির মর্ম আমি উদ্ধার করতে পেরেছি সেদিন!

এরপরের এক বিকেলে গিয়ে দেখি ওদের উঠোনে দাঁড়িয়েই ভয়ানক চিৎকার-চেচামেচি শুরু করেছেন বকুলদি, লুকাদিদের বাড়িওলী। যতই তাকে লুকাদি হাত জোড় করে বোঝাবার চেষ্টা করছেন, তিনি দ্বিগুণ চিৎকারে ফেটে পড়ছেন। পানুদা বাড়িতে নেই, মেসোমশাই কেমন একটা শিশুর চাউনি নিয়ে এদিকওদিক তাকা চ্ছেন আর বকুলদি বলেই চলেছেন-

'বাড়িতে তো ভাইটিকে কখনোই পাওয়া যায় না। আর বুড়োর তো ঐ এক চাউনি!'

লুকাদি মনে হয় কেঁদেই ফেলেন সেদিন। হাত জোড় করে মিনতি করেন এই বেলা চুপ করতে। তাড়াতাড়িই বাড়িভাড়া মিটিয়ে দেবেন পানুদা। নয়তো বাড়ি থেকেই উঠে যাবেন ওরা, যেদিকে পারেন।

বকুলদি গম্ গম্ করতে করতে বাড়ির দিকে চলেন। ঘরের ভিতরে গিয়ে বালিশে মুখ গুঁজে সেকি কান্না লুকাদির। তারপর একসময় আমার দিকে না তাকিয়েই বলে ওঠেন– 'তুই আর এ বাড়িতে আসিস না দিপু। তোর বাড়িতে সকলে যেমন চায় না, লুকিয়ে লুকিয়ে আসিস, আজ আমিই তোকে বলে দিলাম– আমিও চাই না তুই এই বাড়িতে আর আসিস। তোদের বাড়ির সকলে যেমন মনে করে আমি একটা খারাপ মেয়ে, খারাপই তো! আমার সাথে মিশে মিশে খারাপ হয়ে যাচ্ছিস তুই। আজ আমি এই তোকে শেষবারের বলে দিলাম দিপু, তোর মুখ আমি আর দেখতে চাই না!' তারপর শুধু এক মুহূর্ত, কেবল একটি মুহূর্তই সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম আমি। কোন কথা নয়, আর কোন কথা নয় এরপর। আমার মুখ ফুলে ফুলে লাল হয়ে উঠছিল। দু'গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছিল গলিত লাভা। এক দৌড়ে আমি ছুটে এসেছিলাম। সোজা গিয়ে পুকুরের জলে পড়ে থাকা মরা গাছের গুড়িতে বসে পড়ে পাদু'টি জলের তলে চুবিয়ে ছিলাম। আমার এইটুকু হৃদয়ের সব অভিযোগকান্না আমার যত হাসিআন ন্দের সাথী ঐ পুকুরঘাটের সবুজসাদা জ লে ধুয়ে ধুয়ে তার ভারমুক্তি ঘটছিল।

তারপর কতদিন তার সঙ্গে দেখা হয়নি। স্কুল থেকে ফেরার পথে ভীষণ রকমে চেষ্টা করেছি যেন ভুল করেও তাদের জানালার দিকে চোখ না যায়। খুব সাবধানে, সন্তর্পণে বাড়ির সামনের ঐ রাস্ত্মাটুকু পার হয়েছি প্রতিদিন। আমার পঞ্চেন্দ্রিয়ের সব ক'টি ইন্দ্রিয় উৎকর্ণ থেকেছে তখন। শুধু চোখ দুটো সোজা নীচের দিকে রাস্তায় নামিয়ে হেঁটে চলে এসেছি আমি। একদিনের জন্য কি শুনেছি লুকাদি আমাকে জানালাপথে ডাকছেন? আজ আর তা মনে করতে পারি না। তবে মনে হয় আমার ভেতরের সে উৎকণ্ঠার ভার কাটিয়ে উঠতে অনেক সময় লেগেছিল আমার। হঠাৎই আবার এক সময় ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম আমি স্কুল-পড়াশুনা নিয়ে। তখন মনে হয় পড়াশুনাতে ভালই মন হয়েছিল। বন্ধের সকালে এখন আমার এত সব কিছু করার থাকে যে আর সুযোগই হয় না লুকাদিকে দেখতে যাবার!

মাঝে দু'একদিন তাঁকে দেখেছি পুকুরঘাটে, বাসন মেজে আবার বাড়ির পথে চলে যাচ্ছেন দিদি। আমি দূর থেকে তাঁকে দেখেছি। তারপরই বাড়ির ভিতরে গিয়ে ঢুকেছি নিজের কাজে মন দিতে। স্কুলে বড় ক্লাসে উঠেছি, পড়াশুনার চাপ বেড়েছে। বাসাতে গৃহশিক্ষকের কাছে তালিম শুরু হয়েছে। তখন আর আমার সেই সময় কোথায়? পড়াশুনো করে বড় হয়ে জীবনের অপূর্ণতাগুলোকে ঘোঁচাতে হয়– এইটেই আপাতত মাথায় করে নিয়েছি। মায়ের অপূর্ণতা, বাবার ইচ্ছেআকা ঙ্ক্ষাগুলোর সামান্যতম পূর্ণতাও যদি ঘটাতে পারি– তাতেই আমার আজকের সার্থকতা। জীবনের হাসিআন ন্দের সব উদ্যোগআ য়োজনের মাঝেও বাস্তবতার কঠিন নিরেট যে একটা দিক আছে সেই কৈশোরেই আমি তা আঁচ করতে পেরেছি। লুকাদিকে ভুলে গিয়ে আমি আপাতত একান্ত আমারই জীবনসংগ্রামের সূত্রপাত ঘটিয়েছি আমার নিজ গণ্ডীতে।

একদিন সকালবেলা ও বাড়ি থেকে কান্নার শব্দ ভেসে আসে। মায়ের সঙ্গে সঙ্গে আমিও দিদির পিছু পিছু গিয়ে হাজির হই। মেসোমশাই মারা গেছেন ভোর বেলায়। বাবার বুকে আছড়ে পড়ে লুকাদির সেকি কান্না! আমার চৈতন্যের বোধের মর্মের প্রতিটি কণায় সেই আর্তনাদ গিয়ে আছড়ে পড়েছে; আমাকে তারই মত একজন হতভাগ্য করে তুলেছে। মায়ের আঁচল চেপে ধরে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে থাকি আমিও। মা এগিয়ে গিয়ে লুকাদিকে সান্ত্বনা যোগান। দিদি লুকাদির গা-ঘেঁষে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকেন, এক হাতে যেন চোখের জলও মোছেন। পানুদা চিৎকার করে করে বাবাকে ডাকতে থাকেন। বকুলদি এসে তাকেও শান্ত করতে

চেষ্টা করেন খানিক। এক সময় লুকাদি চিৎকার করে ওঠেন বকুলদির দিকে– 'আর আপনাকে জ্বালাতে যাব না দিদি। এবারে আমাদের সব শেষ! এ বাড়ি ছেড়ে যেখানে ইচ্ছা চলে যাব ভাই-বোনে।'

ধীরে ধীরে সব শান্ত হয়ে আসে। লুকাদিকে বুঝিয়ে এখন একবেলা খাইয়েও দেন আমার মা। দিদিও আজকাল লুকাদির প্রসঙ্গে কেমন নিশ্চুপ হয়ে যান। আবারও এক সময় আমার জীবন তার কক্ষপথে ফিরে আসে। আগের চাইতে এখন আমি অনেক বেশি সপ্রতিভ। নিজের চাওয়াপাওয়া, অতীতভবিষ্যতের সমন্বয় ঘটাতে অনেক বেশি উদ্যোগী। জীবনটার একটা মানে– প্রাত্যহিক দিনের সব প্রবাহের মাঝেও জীবনমন্থনের গহীন এক কোণে বিষণ্ন কষ্টগাথার এক মর্মরধ্বনি আমি আজ অনুমান করতে পারি। আমি বুঝে যাই, আমার বুকের এই যে দলাবাঁধা চাপ– দুনিয়াতে আর কোন মন নেই যে এর নাগাল কোনদিন খুঁজে পায়! সেই থেকেই আমি একা। বিষণ্ন ব্যথাতুর; নিজের ভার নিজেই বয়ে চলেছি কেবল, কারো সাথে নেই, পাছে নেই। আত্মকেন্দ্রিক এক মানবশিশু।

কয়েক মাস কেটে গেছে তারপর। হঠাৎই একদিন ঠিক সন্ধ্যের পর লুকাদিকে দেখে পায়ে পায়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছি দরজার পাশে। লুকাদি মায়ের ঘরে ঢুকেছেন। মাকে প্রণাম করে একটা টুল টেনে নিয়ে বসেছেন মায়ের বিছানার ঠিক পাশে। আমার কান খাড়া, চোখ কৌতূহলী, আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় আবারও সজাগ। শুনতে পাচ্ছি লুকাদি মাকে বলছেন– 'কাকিমা তোমার সাথে শেষ দেখা করতে এলাম, আমরা কাল চলে যাচ্ছি।' লুকাদির গলা জড়িয়ে আসে। মা ততক্ষণে শোয়া থেকে খাড়া হয়ে বসেছেন। আজকাল তাঁর শরীরটাও খুব ভাল থাকে না। সন্ধ্যের আগেই শোয়া থেকে ওঠার অভ্যেস থাকলেও আজকাল কেমন একটুখানি সন্ধ্যা গড়িয়েই তিনি ওঠেন বিছানা ছেড়ে। পাঁচপাঁচটি সন্তানের সব ঠিকঠাক রাখতে, বাবার আয়ব্যয়ের সমন্বয় সাধনে, ঘরের কাজে, আমাদের ভাইবোনের সঙ্গে নিরন্তর সংগ্রামে তিনি আজ ক্লান্ত। দেখি লুকাদিকে এক হাতে কাছে টেনে নিয়েছেন মা। লুকাদি তখন ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছেন। মাকে জড়িয়ে ধরে কোন কথাই আর স্পষ্ট বলে উঠতে পারছেন না তিনি। এভাবে কিছুক্ষণ যায়। একসময় আবার শুনতে পাই লুকাদি বলছেন, সম্ভবত মায়ের প্রশ্নের উত্তরেই– 'কাল যশোর পর্যন্ত যাব, আমার এক কাকা সেখানে থাকেন। তারপর সময় বুঝে ভারতেই চলে যাব। এই দেশে আর থাকব না!' আমার গাল বেয়ে যে চোখের ধারা গলে গলে পড়ছে; হাত, মাথা সব যে উষ্ণ হয়ে উঠেছে কখন টের পাইনি। হঠাৎ কখন পায়ে পায়ে ঘরে ঢুকে পড়েছি আমি বুঝতে পারিনি। লুকাদি আমাকে দেখে তাড়াতাড়ি আঁচলে নিজের চোখ মুছে নিয়েছেন। আমাকে পাশে বসিয়ে বলেছেন, 'বোকা মেয়ে কাঁদে না!' বলেছেন, 'তুই অনেক বড় হবি রে দিপু, মন দিয়ে পড়াশুনো করিস।' আমি তখন আর নিজেকে ভেতরে টানতে পারি না। কেমন শব্দ করে বুক থেকে কান্না বেরিয়ে আসে আমার। লুকাদি আমাকে বুকে টেনে নেন। নিজেকে একটু মানিয়ে নিয়ে আমি বলে উঠি, 'তোমাকে কেন দেশ ছাড়তে হবে লুকাদি?' লুকাদির ঠোঁটে একটু হাসি ফুটে ওঠে। ঠিক সেই হাসিটি যেদিন কলাই শাকের ঘণ্ট রান্না করেই রান্না শেষ করেছিলেন তিনি; তার সঙ্গে আমার শেষ দিনগুলোতে।

'বাড়িতে যাই দিপু, খুব সকালেই রওনা দিতে হবে।'

মা ছোট বাটিতে করে দু'টো নাড়ু ও মোয়া, এক গ্লাস জল এনে সামনে ধরেছেন। লুকাদি কেবল জলটুকুই খান। বাকিটা তাঁর আঁচলে মুড়ে নেন। এরপরই উঠে পড়েন তিনি। আমি তখনও নাছোড়বান্দার মত তার হাত ধরে থাকি– 'তুমি দেশ ছেড়ে যেও না লুকাদি!'

লুকাদি মনে হয় বেশ সহজ স্বরেই বলেন, 'নিরন্নের আবার দেশ!' ঠিক মনে করতে পারি না– কোন এক যাত্রাপালায়, তাঁর মুখেই শুনেছিলাম উক্তিটি। সামান্য হাসির কটাক্ষে যাত্রাপালার সেই সংলাপই তিনি শুনিয়ে দেন আমাকে। এরপরই তার শেষ কথাটি আমার উদ্দেশ্যে বলেন লুকাদি– 'সবার সব থাকে না রে দিপু। বড় হ, বুঝতে পারবি। ঈশ্বর চাইলে আবারও আমাদের দেখা হবে।'

দেখা হবে! আবার আমাদের দেখা হতে পারে? সান্ত্বনা হোক, যা-ই হোক আপাতত এইটুকুই আমার সম্বল।

ঐ বোধটুকু বুকে করে আমি দাঁড়িয়ে থাকি। আমাদের উঠোন পেরিয়ে বাঁশের তৈরি বেড়ার দরজা ঠেলে জোড়া তেতুঁলতলার কালো আঁধারের নীচ দিয়ে তাঁর ছায়াটি এক সময় মিলিয়ে যায়।

আজ এতগুলো বছর পেরিয়ে মনে হয়– ঈশ্বর চাইলে এখনও তো আমাদের দেখা হতে পারে! বড় তো আমি হয়েছি কত আগেই। সবার যে সব থাকে না– সে তো বুঝে গেছি। তবু যে কেন মানতে পারি না!

তৃপ্তি বালা

ঘ ট না প ঞ্জি ❖ নভেম্বর

০২ নভেম্বর ১৯৩৫ ❖ শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের জন্ম
০২ নভেম্বর ১৯৬৫ ❖ বলিউড অভিনেতা শাহরুখ খানের জন্ম
০৩ নভেম্বর ১৯৩৩ ❖ নোবেলজয়ী অমর্ত্য সেনের জন্ম
০৪ নভেম্বর ১৯২৫ ❖ চলচ্চিত্রকার ঋত্বিক ঘটকের জন্ম
০৫ নভেম্বর ১৮৭০ ❖ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের জন্ম
১০ নভেম্বর ১৮৪৮ ❖ 'রাষ্ট্রগুরু' সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম
১০ নভেম্বর ১৯৫৪ ❖ কবি জয় গোস্বামীর জন্ম
১১ নভেম্বর ১৮৮৮ ❖ মৌলানা আবুল কালাম আজাদের জন্ম
১১ নভেম্বর ১৯০৮ ❖ গজেন্দ্রকুমার মিত্রর জন্ম
১২ নভেম্বর ১৮৯৬ ❖ পড়্গীবিদ সেলিম আলীর জন্ম
১৪ নভেম্বর ১৮৮৯ ❖ জওহরলাল নেহরুর জন্ম ॥ শিশু দিবস ॥
১৯ নভেম্বর ১৮৩৮ ❖ কেশবচন্দ্র সেনের জন্ম
১৯ নভেম্বর ১৯১৭ ❖ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর জন্ম
২০ নভেম্বর ১৭৫০ ❖ টিপু সুলতানের জন্ম
২৩ নভেম্বর ১৮৯৭ ❖ নীরদচন্দ্র চৌধুরীর জন্ম
২৫ নভেম্বর ১৯৩৪ ❖ কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম
২৬ নভেম্বর ১৮৯৭ ❖ আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম
২৭ নভেম্বর ১৮৭৮ ❖ কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর জন্ম
৩০ নভেম্বর ১৮৫৮ ❖ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর জন্ম
৩০ নভেম্বর ১৯০৮ ❖ বুদ্ধদেব বসুর জন্ম

Saffola Active

Introducing new 'Saffola Active', blended edible vegetable oil. It brings you the benefits of 2 oils (80% Rice Bran & 20% Soyabean) in one. Saffola Active is more effective for heart than any other ordinary vegetable oil. And it promises you healthy heart and healthy life.

Triple Action

Saffola Active is enriched with **Triple Action Formula** that contains the goodness of Omega 3, Oryzanol and Vitamin E which help to reduce LDL (bad cholesterol) levels.

LOSORB™ TECHNOLOGY

Saffola Active comes with patented **LOSORB technology**. Foods cooked in Saffola Active have lower fats due to lower absorption of oils while cooking.

5 Antioxidant

Saffola Active also has the **goodness of 5 antioxidants** which keeps your heart and life healthy.

So, start using Saffola Active from today and keep your family healthy and always rejuvenized. Available in 1 litre and 5 litres jars.

marico

Healthy Heart
Healthy Life

শিশুতীর্থ

রাজা বিক্রমাদিত্য ও বত্রিশ পুতুলের গল্প

পুনর্কথন **ড. দুলাল ভৌমিক**

ভূমিকা

সংস্কৃত সাহিত্যে গল্প অত্যন্ত সমৃদ্ধ একটি শাখা। নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি বিষয়ে গল্পের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এ সাহিত্যের সৃষ্টি। শিশু কি শোরুযুবা বৃদ্ধ সব বয়সের মানুষই এ থেকে শিক্ষালাভ করতে পারে। মানুষের পাশাপাশি মনুষ্যেতর প্রাণী, এমনকি জড়বস্তুও এতে চরিত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। সহজ সরল ভাষায় এমন আশ্চর্য ভঙ্গিতে গল্পগুলো রচিত যে, অতি সহজেই সেগুলো পাঠকচিত্ত আকর্ষণ করে।

সংস্কৃত গল্পসাহিত্যের সবচেয়ে প্রাচীন ও সার্থক গ্রন্থ হচ্ছে পঞ্চতন্ত্র। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতক কিংবা তার কিছু পরে বিষ্ণুশর্মা এটি রচনা করেন। এর অনুকরণে পরবর্তীকালে নারায়ণ শর্মা রচনা করেন হিতোপদেশ। এছাড়া আরো কয়েকটি বিখ্যাত গল্পগ্রন্থ হল গুণাঢ্যের বৃহৎকথা, বুদ্ধস্বামীর বৃহৎকথা শ্লোকসংগ্রহ, ক্ষেমেন্দ্রের বৃহৎকথামঞ্জরী, শিবদাসের বেতালপঞ্চবিংশতি, দণ্ডীর দশকুমারচরিত, সোমদেব ভট্টর কথাসরিৎসাগর ইত্যাদি। এগুলো ছাড়া আরো একটি উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ হচ্ছে দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকা। এটি মহাকবি কালিদাসের রচনা বলে কথিত হয়। সে হিসেবে এর রচনাকাল খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতক। এই দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকাই রাজা বি ক্রমাদিত্য ও বত্রিশ পুতুলের গল্প নামে বাংলা ভাষায় নতুনভাবে উপস্থাপিত হল।

দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকার গল্পগুলো রাজা বিক্রমাদিত্যকে নিয়ে রচিত। তাঁর বিভিন্ন গুণের কথা এতে বর্ণিত হয়েছে।

বিক্রমাদিত্যরা ছিলেন দুই ভাই। অগ্রজ ভর্তৃহরি– উজ্জয়িনীর রাজা। একদিন তিনি অনুজ বিক্রমাদিত্যকে রাজ্যভার অর্পণ করে বানপ্রস্থ গ্রহণ করেন। বিক্রমাদিত্য রাজ্যের সকলকে পরম সমাদরে পালন করে সকলের প্রিয়ভাজন হন।

একদিন প্রত্যুষে এক দিগম্বর সন্ন্যাসী আসেন তাঁর কাছে। তিনি মহাশ্মশানে এক মহাহোম করবেন। তাই যাতে কোন বিঘ্ন না ঘটে তার ব্যবস্থা গ্রহণে রাজাকে অনুরোধ করেন। বিক্রমাদিত্য সর্বপ্রকারে সন্ন্যাসীকে সাহায্য করেন এবং সন্ন্যাসী অত্যন্ত প্রীত হন। তাঁর আশীর্বাদে বিক্রমাদিত্য বেতালসিদ্ধ হন। বেতাল হল প্রেতাত্মা এবং সর্বকাজে পারদর্শী।

এদিকে ঋষি বিশ্বামিত্র কঠোর তপস্যায় রত। তাঁর ধ্যান ভঙ্গ করতে হবে। একা জে কে সমর্থ– রম্ভা না উর্বশী? দেবরাজ ইন্দ্র মহাচিন্তায় পড়লেন। দেবর্ষি নারদ বললেন: এ ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত দিতে পারেন একমাত্র রাজা বিক্রমাদিত্য।

দেবরাজের নির্দেশে তাঁর সারথি মাতলি পুষ্পকরথ নিয়ে মর্তে বিক্রমাদিত্যের নিকট হাজির হলেন। মাতলির মুখে সব শুনে বিক্রমাদিত্য রথে চড়ে স্বর্গে গেলেন– দেবরাজের সভায়। সেখানে শুরু হল রম্ভাউর্বশীর নৃত্যগী তের প্রতিযোগিতা। কেউ কম নন। তবে বিক্রমাদিত্যের সূক্ষ্ম বিচারে উর্বশী অধিকতর যোগ্য বলে বিবেচিত হলেন।

দেবরাজ ভীষণ খুশি হলেন বিক্রমাদিত্যের বিচারের ক্ষমতা দেখে। তাই পুরস্কারস্বরূপ তিনি বিক্রমাদিত্যকে মণিমাণিক্যখচিত একটি বহুমূল্য রত্নসিংহাসন উপহার দিলেন। বিক্রমাদিত্য সিংহাসন নিয়ে রাজ্যে ফিরে এলেন এবং কোন এক শুভদিনে শুভক্ষণে সিংহাসনে উপবেশন করলেন। আর সুখে প্রজাপালন করতে লাগলেন

হঠাৎ একদিন রাজ্যে ভীষণ বিপদ দেখা দিল। ধূমকেতুর উদয়, ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত, প্রলয়ঝড়– কোনটাই বাদ নেই। রাজা এর কারণ জানতে চাইলেন। তিনি দৈবজ্ঞদের ডাকলেন। তাঁরা বললেন: সন্ধ্যাকালে ভূমিকম্প হলে কিংবা অগ্ন্যুৎপাত পীতবর্ণযুক্ত হলে রাজার প্রাণনাশের আশঙ্কা দেখা দেয়।

একথা শুনে রাজার তখন অতীতের একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল। তিনি একবার মহাশক্তির সাধনা করেছিলেন। সাধনায় তুষ্ট হয়ে দেবী তাঁকে বর দিতে চাইলেন। রাজা অমরত্বের বর চাইলেন। দেবী বললেন: জগতে কেউ অমর নয়। তবে একমাত্র আড়াই বছরের কন্যার গর্ভজাত পুত্রের হাতেই তোমার মৃত্যু হবে।

বিক্রমাদিত্যের একথা শুনে দৈবজ্ঞরা বললেন: কোথাও আড়াই

বছরের কন্যার পুত্র জন্মেছে কিনা তা অনুস ন্ধান করা প্রয়োজন।

বিক্রমাদিত্যের নির্দেশে বেতাল অনুসন্ধানে বের হল। কিছুদিনের মধ্যেই সে সঠিক খবর নিয়ে ফিরে এল। প্রতিষ্ঠা নগরে শেষনাগের ঔরসে আড়াই বছরের কন্যার গর্ভে এক পুত্র সন্তানের জন্ম হয়েছে। নাম তাঁর শালিবাহন। তিনি এখন কৈশোরে পদার্পণ করেছেন।

বেতালের কথা শুনে রাজার কপালে চিন্তার রেখা দেখা দিল। তিনি আর বিলম্ব না করে তরবারি নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। শালিবাহনের সঙ্গে তাঁর ভীষণ যুদ্ধ হল। কিন্তু ভবিতব্য অনুযায়ী এই শালিবাহনের হাতেই বিক্রমাদিত্যের মৃত্যু হল।

বিক্রমাদিত্য ছিলেন অপুত্রক। তাই তাঁর সভাপণ্ডিত বললেন: অনুসন্ধান করা হোক রাজার কোন রানি অন্তঃসত্ত্বা কিনা।

অনুসন্ধানে জানা গেল– রানিদের মধ্যে একজনের গর্ভসঞ্চার হয়েছে। তখন সেই গর্ভস্থ সন্তানের নামে পারিষদবর্গ রাজ্য পরিচালনা করতে লাগলেন। দেবরাজ প্রদত্ত সিংহাসনটি শূন্যই পড়ে রইল।

কিছুদিন পরে পারিষদবর্গ এক দৈববাণী শুনতে পেলেন: যেহেতু এই সিংহাসনে বসার উপযুক্ত কেউ নেই, সেহেতু একে একটি পবিত্র স্থানে রাখা হোক।

দৈববাণী অনুযায়ী পারিষদবর্গ সিংহাসনটিকে একটি পবিত্র স্থানে রেখে দিলেন। কালক্রমে একদিন সিংহাসনটি মাটির নিচে চাপা পড়ে গেল। সবাই ভুলেই গেল যে, এখানে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের ঐতিহ্যবাহী রত্নসিংহাসনটি ছিল। সেই জায়গাটি এখন কৃষিক্ষেত্র এবং এক ব্রাহ্মণ চাষির দখলে। তিনি ঐ জায়গায় একটি মাচা তৈরি করে তার উপর বসে খেত পাহারা দেন।

একদিন ঘটল এক অলৌকিক ঘটনা। ব্রাহ্মণ মাচার উপরে বসে আছেন। এমন সময় মহারাজ ভোজ সসৈন্যে ওর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। ব্রাহ্মণ বিনয়ের সঙ্গে বললেন: মহারাজ! আপনি আমার অতিথি। আপনার অশ্বগুলো ক্ষুধার্ত, পরিশ্রান্ত। ওগুলোকে আমার খেতে ছেড়ে দিন। ওরা যথেচ্ছ আহার গ্রহণ করুক।

ব্রাহ্মণের কথা শুনে রাজা থামলেন এবং সৈন্যদের বললেন অশ্বগুলোকে ছেড়ে দিতে। সৈন্যরা তাই করল এবং অশ্বগুলো যথেচ্ছ খেতের ফসল খেতে লাগল।

এমন সময় ব্রাহ্মণ মাচা থেকে নেমে এসে আর্তস্বরে চিৎকার করে বলতে লাগলেন: একি করছেন, মহারাজ! রাজা হয়ে প্রজা পীড়ন করছেন! দেখুনতো আপনার অশ্বগুলো আমার খেতের কিরূপ ক্ষতিসাধন করছে!

ব্রাহ্মণের কথায় রাজা তো হতবাক। তিনি সৈন্যদের বললেন খেত থেকে অশ্বগুলো তুলে আনতে। সৈন্যরা তাই করল এবং রাজা চলে যেতে উদ্যত হলেন। এমন সময় ব্রাহ্মণ মাচায় গিয়ে বসে আবার মিনতিভরা কণ্ঠে বলতে লাগলেন: একি মহারাজ! আপনি চলে যাচ্ছেন যে? আপনি না আমার অতিথি? অতিথি বিরূপ হয়ে চলে গেলে আমার অমঙ্গল হবে। আপনি ইচ্ছেমত অশ্বগুলোকে খেতের ফসল খাওয়ান।

রাজা ভোজ এবার বিস্মিত হলেন ব্রাহ্মণের এই অদ্ভুত আচরণ দেখে। ব্রাহ্মণ মাচার উপরে থাকলে একরকম আচরণ করেন, মাচা থেকে নামলে আবার অন্যরূপ ধারণ করেন। তিনি এর রহস্য ভেদ করার জন্য স্বয়ং মাচার উপরে গিয়ে বসলেন। তখন তিনি অনুভব করলেন– তাঁর মধ্যেও এক বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেছে। তিনিও যেন তাঁর সমস্ত সম্পদ প্রজাদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে পারেন। তিনি বুঝতে পারলেন– এই মাচার নিচে অলৌকিক কিছু একটা আছে। তিনি তখন মাচা থেকে নেমে এসে যথেষ্ট দাম দিয়ে ব্রাহ্মণের কাছ থেকে ঐ জায়গাটি কিনে নিলেন। যথাসময়ে মাটি খুঁড়ে দেখতে পেলেন একটি সিংহাসন। এটিই দেবরাজ প্রদত্ত মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সেই রত্নসিংহাসন। ভোজরাজ যারপরনাই খুশি হলেন। কিন্তু শত চেষ্টা করেও সিংহাসনটি তিনি তুলতে পারলেন না। তারপর মন্ত্রীর পরামর্শে তিনি যথাবিহিত যাগ্নয জ্ঞাদির অনুষ্ঠান করলেন এবং তখন সিংহাসনটি আপনি উঠে এল। রাজা ভোজ অতি যত্নের সঙ্গে সিংহাসনটি রাজধানীতে নিয়ে এলেন। সিংহাসনে বত্রিশটি পুতুলের মূর্তি খোদিত ছিল। রাজা যখন পুতুলগুলোর মাথায় পা রেখে সিংহাসনে বসতে যাচ্ছিলেন, তখন প্রত্যেকটি পুতুল রাজা বিক্রমাদিত্যের শৌর্য্যবীর্য, দয়াদাক্ষিণ্য ইত্যাদি সম্পর্কে একেকটি গল্প বলেছিল। এ থেকেই গ্রন্থের নাম হয়েছে দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকা। এতে বত্রিশটি গল্প আছে। বর্তমান কালের পাঠকের উপযোগী করে গল্পগুলো রাজা বিক্রমাদিত্য ও বত্রিশ পুতুলের গল্প নামে নতুনভাবে উপস্থাপিত হল। এ গল্পগুলো পড়লে পাঠকের মধ্যে, বিশেষত শিশুদের মধ্যে মহানুভবতা, পরোপকারিতা, দানশীলতা, ধৈর্য, শৌর্য, বীর্য, ঔদার্য, সাহসিকতা ইত্যাদির মনোভাব সৃষ্টি হবে।

এ পর্যন্ত আমরা উনত্রিংশটি পুতুলের গল্প শুনেছি। এবার শোনা যাক ত্রিংশ, একত্রিংশ ও দ্বাত্রিংশ পুতুলের গল্প:

ত্রিংশ পুতুলের গল্প

ভোজরাজ এবার ত্রিংশ পুতুলের মাথায় পা দিয়ে সিংহাসনে বসতে গেলেন। পুতুলটি তখন বলল: হে রাজন! আপনি যদি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের ন্যায় বুদ্ধি ও প্রতিভার অধিকারী হন, তাহলে তাঁর এই দিব্যসিংহাসনে বসার যোগ্য বিবেচিত হবেন।

ভোজরাজ বললেন: মহারাজ বিক্রমাদিত্য কিরূপ বুদ্ধিমান ও প্রতিভার অধিকারী ছিলেন?

পুতুলটি বলতে লাগল: মহারাজ একদিন পারিষদবর্গকে নিয়ে রাজদরবারে বসে আছেন। এমন সময় এক জাদুকর এক পরমা সুন্দরী স্ত্রীলোককে নিয়ে দরবারে উপস্থিত হলেন। মহারাজকে অভিবাদন জানিয়ে জাদুকর বললেন: মহারাজ! ইনি আমার স্ত্রী। আমরা মূলত স্বর্গের অধিবাসী। দেবরাজের অভিশাপে মর্তে অবস্থান করছি। স্বর্গে ন্মা কি দেব্লদান বের যুদ্ধ শুরু হয়েছে। তাই দেবরাজ আমাকে যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য আদেশ দিয়েছেন। শুনেছি আপনি পরস্ত্রীর প্রতি সহোদরের ন্যায় আচরণ করেন। স্লেকার ণে আমার স্ত্রীকে আপনার নিকট গচ্ছিত রেখে আমি যুদ্ধে যাওয়ার সংকল্প করেছি। আপনি যদি অনুগ্রহ করে আমার স্ত্রীকে আশ্রয় দেন, তাহলে আমি আপনার নিকট কৃতজ্ঞ থাকব।

জাদুকরের কথায় মহারাজ সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। মহারাজকে ধন্যবাদ জানিয়ে জাদুকর খড়গের উপর ভর করে আকাশে উঠে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরেই আকাশ থেকে রক্তমাখা একটা খড়গ পড়ল। তারপর ছিন্নভিন্ন, হাতপা, মাথা আর শরীর পড়ল। জাদুক রের স্ত্রী তা দেখে চিৎকার করে বললেন: মহারাজ! এ যে আমার স্বামীরই ছিন্নভিন্ন দেহ! তিনি আর এ জগতে নেই! শত্রুহস্তে নিহত হয়েছেন! তবে আমি আর এ দেহ ধারণ করব কেন? চন্দ্র অস্ত গেলে জ্যোৎস্নাও অন্তর্হিত হয়! মেঘের সঙ্গে ক্ষণপ্রভাও বিদায় নেয়! শাস্ত্রে আছে– যুদ্ধে পতি নিহত হলে স্ত্রীর পক্ষে অগ্নিপ্রবেশই বিধেয়! এর ফলে তার স্বর্গলাভ হয়! সতী হিসেবে সে পূজিতা হয়! তাই, হে মহারাজ! আপনি আমায় অগ্নিতে আত্মাহুতি দানের অনুমতি দিন!

জাদুকরের স্ত্রীর কথা শুনে মহারাজ তাঁকে স্বামীর খণ্ডিত দেহের সঙ্গে আত্মাহুতি দানের অনুমতি দিলেন।

পরের দিন মহারাজ দরবারে বসে আছেন। এমন সময় সেই জাদুকর এসে বললেন: মহারাজ! যুদ্ধে দেবতাদের জয় হয়েছে। তাই দেবরাজ খুশি হয়ে আমাদের শাপমুক্তি দিয়েছেন। আপনি অনুমতি দিলে স্ত্রীকে নিয়ে আমি স্বর্গে চলে যাব।

একথা শুনে সভাসদগণ অত্যন্ত বিষণ্ন হয়ে বললেন: কিন্তু তিনি তো অগ্নিতে আত্মাহুতি দিয়েছেন!

জাদুকর উদ্বেগের সঙ্গে বললেন: এ কি সত্যি, মহারাজ?

মহারাজ হাসতেহাস তে বললেন: সবটাই যখন জাদু, তখন আপনার স্ত্রীর আত্মাহুতিও জাদু। আমি আপনাদের জাদু দেখে মুগ্ধ। এবার আপনি স্ত্রীকে নিয়ে স্বগৃহে প্রস্থান করুন।

এই বলে মহারাজ জাদুকরকে সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দানের আদেশ দিলেন।

জাদুকর প্রসন্ন হয়ে বললেন: মহারাজ! আমি এরূপই প্রত্যাশা করেছিলাম। আপনি সত্যি মহৎ। পরস্ত্রীর প্রতি সত্যিই আপনি সহোদরের ন্যায় আচরণ করেন।

পুতুলটি এভাবে মহারাজের বুদ্ধি ও প্রতিভার পরিচয় দিয়ে ক্ষান্ত হলে ভোজরাজ নির্বাক দাঁড়িয়ে রইলেন।

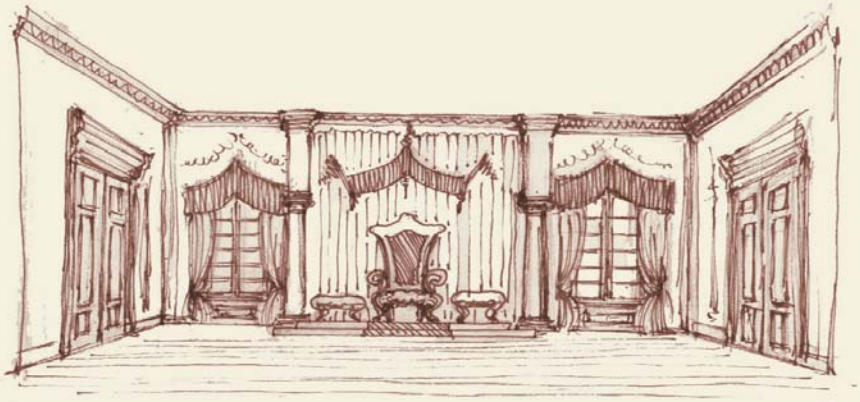

একত্রিংশ পুতুলের গল্প

ভোজরাজ বিক্রমাদিত্যের বুদ্ধি ও প্রতিভার কথা চিন্তা করতে লাগলেন। এভাবে অনেকক্ষণ কাটিয়ে দিয়ে পুনরায় সিংহাসনে আরোহণের উদ্যোগ নিলেন। তখন একত্রিংশ পুতুলটি বলল: হে ভোজরাজ! আপনি যদি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের ন্যায় সাহস ও অষ্টসিদ্ধি লাভ করে থাকেন, তাহলে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন।

ভোজরাজ জানতে চাইলেন মহারাজের সাহস ও অষ্টসিদ্ধি লাভের কথা। পুতুলটি বলতে লাগল: একবার এক কাপালিক সন্ন্যাসী মহারাজের কাছে এসে বললেন: মহারাজ! অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা চতুর্দশী তিথিতে মহাশ্মশানে আমি এক হোম করব। সেই মহাশ্মশানের অল্পদূরে এক শমীবৃক্ষ আছে। সেই বৃক্ষে এক ভয়ঙ্কর বেতাল বাস করে। কেউ তার ধারেকা ছে যেতে সাহস করে না। কিন্তু ঐ বেতালকে ছাড়া আমার হোম হবে না। এ অবস্থায় একমাত্র আপনিই পারেন তাকে এনে দিতে। তবে একটি ব্যাপার আছে। বেতালকে কাঁধে নিয়ে আপনি যখন আসতে থাকবেন, তখন সে একটি গল্প বলবে। গল্পশেষে আপনাকে একটি প্রশ্ন করবে। আপনি যদি সঠিক উত্তর দেন, তাহলে বেতাল আবার শমীবৃক্ষে চলে যাবে। আর যদি ভুল উত্তর দেন, তাহলে সে আপনার মাথা চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেলবে।

সব শুনে মহারাজ সন্ন্যাসীর প্রস্তাবে রাজি হলেন এবং তাঁর সঙ্গে মহাশ্মশানে গেলেন। সেখান থেকে সেই শমীবৃক্ষের কাছে গিয়ে যখন বেতালকে কাঁধে নিয়ে আসতে লাগলেন, তখন বেতাল একটি গল্প বলতে লাগল: হিমালয়ের দক্ষিণে বিন্ধ্যবতী নামে এক রাজ্য আছে। সেখানকার রাজার নাম সুবিচারক। তাঁর পুত্র ময়সেন একদিন মৃগয়ায় গেছেন। মৃগয়া থেকে ফেরার পথে নদীতীরে ময়সেন একজন ব্রাহ্মণকে দেখতে পেলেন। ব্রাহ্মণ তপস্যা করছিলেন। ময়সেন তাঁকে অশ্বের রজ্জু ধরতে বলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ সম্মত হননি। তাই ময়সেন ক্রুদ্ধ হয়ে ব্রাহ্মণকে চাবুক মারেন। ব্রাহ্মণ রাজদরবারে গিয়ে ময়সেনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে রাজপুত্রকে দেশত্যাগের নির্দেশ দেন।

তখন মন্ত্রী রাজাকে বলেন: মহারাজ! রাজপুত্রকে রাজ্যভোগ থেকে বঞ্চিত করুন, কিন্তু দেশান্তরী হতে বাধ্য করবেন না।

রাজা বলেন: না, ব্রাহ্মণকে প্রহার করায় তাকে সমুচিত দ-ই দেওয়া হয়েছে।

মন্ত্রী পুনরায় অনুরোধ করে বলেন: মহারাজ! রাজপুত্র অবুঝ, নাবালকতুল্য; এবারের মত তাঁকে ক্ষমা করে দিন।

রাজার সুবিচার এবং মন্ত্রীর অনুরোধ দেখে ব্রাহ্মণও শেষে শাস্তি থেকে রাজপুত্রকে অব্যাহতি দিতে রাজাকে অনুরোধ করেন। অগত্যা রাজা দ- মওকুফ করে অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন।

গল্পশেষে বেতাল মহারাজকে প্রশ্ন করে: রাজা, মন্ত্রী ও ব্রাহ্মণের মধ্যে কে সর্বাপেক্ষা মহৎ?

মহারাজ বললেন: রাজাই সর্বাপেক্ষা মহৎ। কারণ ব্রাহ্মণের ধর্মই ক্ষমা করা। আর রাজা মন্ত্রীর অন্নদাতা, তাই মন্ত্রীর পক্ষে এরূপ অনুরোধ জানানোই স্বাভাবিক।

মহারাজের উত্তর সঠিক হওয়ায় বেতাল শমীবৃক্ষে ফিরে গেল এবং মহারাজ পুনরায় তাকে কাঁধে করে আনতে লাগলেন।

এভাবে বেতাল মহারাজকে পঁচিশটি গল্প বলল এবং মহারাজ তার সঠিক উত্তর দিলেন। মহারাজের এরূপ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পেয়ে বেতাল অত্যন্ত প্রসন্ন হল এবং মহারাজকে বলল: হে রাজন! আমাকে নিয়ে ঐ মহাশ্মশানে গেলে ঐ কাপালিক সন্ন্যাসী কালভৈরবীর সামনে আপনাকে বলি দেবেন। তিনি আপনাকে আভূমি লুণ্ঠিত হয়ে দেবীকে প্রণাম করতে বলবেন। তখনই খড়্গ দিয়ে তিনি আপনার শিরশ্ছেদ করবেন। এতে তাঁর অষ্টসিদ্ধি লাভ হবে। কিন্তু আপনাকে যখন তিনি প্রণাম করতে বলবেন, তখন আপনি বলবেন– আপনি সার্বভৌম রাজা। প্রণাম করতে জানেন না। আপনি তাঁকে বলবেন প্রণাম করা দেখিয়ে দিতে। যখনই তিনি প্রণাম করা দেখাতে মাথা নত করবেন, তখনই দেবীর হাতের খড়্গ দিয়ে তাঁর শিরশ্ছেদ করবেন।

বেতালের কথা অনুযায়ী মহারাজ সন্ন্যাসীর শিরশ্ছেদ করে অণিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব ও কামাবসায়িতা এই অষ্টসিদ্ধি লাভ করেন।

পুতুলের মুখে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সাহস ও অষ্টসিদ্ধি লাভের কাহিনি শুনে ভোজরাজ নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

দ্বাত্রিংশ পুতুলের গল্প

একত্রিংশটি পুতুলের মুখে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের বিভিন্ন গুণের পরিচয় পেয়ে ভোজরাজ অত্যন্ত মুগ্ধ হলেন। বিক্রমাদিত্যের তুলনায় নিজেকে খুবই ক্ষুদ্র মনে হল তাঁর। কিন্তু এমন মণিরত্ন খচিত দৈবসিংহাসনে বসার আকাঙ্ক্ষাও তিনি ত্যাগ করতে পারছেন না। তাই দ্বাত্রিংশ পুতুলের মাথায় পা দিয়ে যেই তিনি সিংহাসনে বসার উদ্যোগ নিলেন, অমনি পুতুলটি বলে উঠল: হে রাজন্! মহারাজ বিক্রমাদিত্যের বীরত্ব ও মহত্ত্ব ছিল অপরিসীম। তিনি একটিমাত্র তরবারির সাহায্যে পৃথিবী জয় করেছিলেন। অপরকে বিপদমুক্ত করার জন্য তিনি সর্বদাই সচেষ্ট থাকতেন। প্রজাদের কল্যাণের জন্য তিনি যা প্রয়োজন তাই কর তেন। তিনি ছিলেন মহানুভব ও পরাক্রমশালী। অবশ্য আপনিও বিশেষ গুণে গুণান্বিত। আপনারা উভয়েই নারায়ণের অংশসম্ভূত। আপনাদের কৃপায় আজ আমাদের বত্রিশজনের শাপমুক্তি ঘটল।

পুতুলের কথা শুনে ভোজরাজ বিস্মিত হলেন। তিনি পুতুলের উদ্দেশে বললেন: তোমরা অভিশপ্ত হলে কেন?

পুতুলটি বলল: আমরা সকলেই ছিলাম দেবী পার্বতীর সখী। একদিন মহেশ্বর কৌতুকবশত আমাদের প্রতি প্রেমবিলাসের দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন। এতে দেবী আমাদের ভুল বোঝেন এবং অভিশাপ দিয়ে বলেন: তোমাদের ইন্দ্রের সিংহাসনে পুতুল হয়ে দীর্ঘদিন থাকতে হবে। ইন্দ্র সেই সিংহাসন মহারাজ বিক্রমাদিত্যকে দান করবেন। পরবর্তীকালে সেই সিংহাসন ভোজরাজ উদ্ধার করবেন। তিনি যখন সিংহাসনে আরোহণ করতে যাবেন, তখন তোমাদের সকলের মুখে বিক্রমাদিত্যের গুণাবলি ধৈর্যসহকারে শ্রবণ করলে তোমাদের শাপমুক্তি ঘটবে।

আজ আমাদের সেই শুভদিন উপস্থিত। তাই আপনাদের উভয়ের নিকট আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। এবার আমাদের নামগুলো শুনুন: কামরসিকা, সুপ্রভা, প্রভাবতী, ইন্দ্রসেনা, সুদতী, অনঙ্গসেনা, কুরঙ্গনয়না, লাবণ্যবতী, কামবালিকা, চ-িকা, বিদ্যাধরী, প্রজ্ঞাবতী, জনমোহিনী, বিদ্যাবতী, নিরুপমা, হরিমধ্যা, মদনসুন্দরী, বিলাসরসিকা, শৃঙ্গারকলিকা, মন্মথসঞ্জীবনী, রতিলীলা, মদনবতী, চিত্ররেখা, সুরথগহ্বরা, প্রিয়দর্শিনী, কামোন্মাদিনী, সুখসাগরা, শশীকলা, উন্মাদিনী, মিশ্রবেশিনী, হংসগামিনী ও চন্দ্ররেখা।

এই বলে পুত্তলিকাগণ দিব্যদেহ ধারণ করে ভোজরাজের অনুমতি নিয়ে স্বর্গ অভিমুখে প্রস্থান করলেন। আর ভোজরাজ দেবেন্দ্র প্রদত্ত সেই রত্নসিংহাসনে উপবেশন করে তাঁর মনোবাসনা পূরণ করলেন।

• সমাপ্ত

ড. দুলাল ভৌমিক শিক্ষাবিদ, প্রাবন্ধিক

অনুবাদ গল্প

কালাপাহাড়

রাজকিশোর রায়

প্রাচীন নদীর ধারে এক জনবসতির মধ্যে সেই পরিবারটি। হঠাৎ একদিন সেই পরিবারে চাঞ্চল্য দেখা গেল।

প্রাচী নদীতে বহু জল বহিয়া গিয়াছে, কাল্লক ল্লোলের ছন্দমুখর অজস্র সন্ধ্যা কাটিয়া গিয়াছে; কিন্তু সেই সন্ধ্যাটি জয়শীলা ও লোককান্ত উভয়ের মনে এক সার্থক স্মৃতিলেখা আঁকিয়া দিয়াছিল।

কাহিনিটি বহুদিন আগের। জয়শীলা স্বর্গে। লোককান্ত বাঁচিয়া আছেন। কয়টি নিরলস মধ্যাহ্ন। অপরাহ্নে, সন্ধ্যায় তিনি প্রাচী নদীর দিকে চাহিয়া কত কথা ভাবেন। তাঁর অতীত কীর্তিকলাপ বড় ছেলেমানুষের মত বলিয়া আজ তাঁর মনে হয়, তাঁর অবচেতন মনের ভিতর হইতে একটা বাল্কময় সরীসৃপ বাহির হইয়া আসিয়া তাঁর দেহে জড়াইয়া দুইটা সদাচলিত চক্ষু দিয়া ঘিরিয়া গ্রাস করিয়া বলে...

– হে যুগসন্ধ পুরুষ, বড় কাজ করিয়াছ। হে মহাচেতা বন্ধু, ঠিক রাজপথ ধরিয়া না চলিয়া অল্লিগলির ম ধ্যে ঢুকিয়া যা আবিষ্কার করিলে তা অতি মহৎ ও শ্লাঘনীয়। এখন তোমার প্রাপ্য হিসাবে দেশ যা দিয়াছে তার অতিরিক্ত কয়েকটি চুম্বন তোমার অঙ্গে দিয়া যাইতেছি, তা সরীসৃপীয় হইলেও আমার আশা, তুমি গ্রহণ করিবে।

সারথির স্ত্রী ভিতর হইতে গলা চড়াইয়া বলিলেন– শেফী, বাবা বুঝি কারিগরী কথা কিছু ভাবছেন। এমন কত সময় বসে থাকেন। একটা কিছু ঠিকমত মনে না আসা অবধি এমনি বসে থাকবেন। মনে একবার এসে গেলে হাসতে হাসতে উঠে পাথর একখানা টেনে নিয়ে ঠুকঠাক শুরু করবেন। আজ তো এ নতুন নয়। যা, নট্টুঅ ভাই কে বলগে পঞ্চাশ টাকার কমে কোণার্কের ঘোড়ার মূর্তি বিক্রি হবে না। দুশো টাকার কাজ পঞ্চাশ টাকায় দেওয়া হচ্ছে, টানাটানি চলেছে বলেই না!

লোককান্ত শিহরিয়া উঠিতেছিলেন। প্রাচী নদীর জলতরঙ্গে তাঁর পৌরুষের রূপ প্রতিফলিত হইতেছিল। অনতিদূরে সর্বশুভময়ী মা মঙ্গলার মন্দির হইতে আরতির ঘণ্টার নিঃস্বন ভাসিয়া আসিতেছিল।

লোককান্ত সেই স্মরণীয় সন্ধ্যায় কোথা হইতে হাঁপাইতে হাঁটাইতে আসিয়া ডাক পাড়িলেন

– জয়শীলা, দরজা খোল।

জয়শীলা তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া দেখেন স্বামী কী একটা কাঁধে করিয়া আনিয়াছেন, সেই পদার্থটার উপর তাঁর দোলাইখানি জড়ানো রহিয়াছে। পদার্থটির দৈর্ঘ্য আছে প্রস্থ আছে উচ্চতা আছে। ওজনও আছে বোঝা যাইতেছিল, নহিলে সেটা বহিয়া আনিতে তিনি হাঁপাইয়া উঠিবেন কেন!

– দরজায় কপাট দাও, খিল দিয়ে দাও। শোন, এটা আমি আর কাঁধ থেকে নামাব না। জয় দুর্গা বলে এসেছি, সেই দুর্গা নাম নিয়ে কাজটা একেবারে সেরে ফেলি। জয়শীলা, প্রদীপ নিয়ে বসে তুমি ঘণ্টাখানেক কেবল দুর্গানাম স্মরণ কর, তাঁকে ডেকে বল যেন সব বাধাবিঘ্ন দুর্বিপাক পরমেশ্বরী বরাভয়ার কৃপায় দূর হয়ে যায়।

জয়শীলা স্বামীর এই মূর্তি দেখিয়া আর এমনি কথা শুনিয়া হতভম্ব হইয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তারপর ভাবিলেন স্বামী নিশ্চয় কিছু চোরাই মাল ঘরে আনিয়াছেন। পুলিশ বুঝিবা পিছন পিছন আসি তেছে। তাঁর চোখে এ সংসার যেন জ্বলিয়া গেল মনে হইল। তিনি তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলিলেন

– কী, চোরাই মাল? এমন চোরের মত করছ কেন? এ দুর্বুদ্ধি তোমায় কে দিল? সুখেদুঃখে সংসার চলে যাচ্ছে। ভগবান যখন যা দিয়েছেন তাতেই আমি চালিয়ে নিয়েছি। এখন এ কী কাণ্ড? তোমার পায়ে পড়ি তুমি যা এনেছ আর কোথাও রেখে এস, নয়তো মাটিতে পুঁতে ফেলে এস। পুলিশ যদি পিছন পিছন আসতে থাকে তবে তো সর্বনাশ!

লোককান্ত দেখিলেন স্ত্রী জয়শীলা উত্তেজিত হইয়াছেন। মেয়েমানুষ কী বোঝে এ দুনিয়ার কূটকৌশল? বিবাহের বেদীর লোকটাকে স্বামী বলে, সন্তানের জন্ম দেয়, আর সঙ্কীর্ণ মন লইয়া পড়িয়া থাকে।

লোককান্ত খিড়কির দিকে যাইতে যাইতে বলিলেন

– আচ্ছা, খন্তাটা দাও– না খন্তায় হবে না, সময় যাবে– কোদালটা দাও। তুমি আমার সঙ্গে এস না। কেবল দুর্গা, মঙ্গলা, অম্বিকা যা মনে আসে তাঁর নাম নাও। তোমার কথামতই আমি এটা পুঁতে ফেলতে যাচ্ছি। দামী জিনিস, মণ্ণিমাণিক্যও এর কাছে লাগে না। যতদিন যাবে এটা ততই আরো দামী হবে, শেষে অমূল্য হয়ে উঠবে।

জয়শীলার মন কেমন নরম হইয়া আসিল। নারীসুলভ কৌতূহলের বশে তিনি ভাবিলেন– আহা, স্বামী এখনি পুঁতে ফেলবেন, পোঁতার আগে একবারটি যদি দেখতে পেতাম কী অমূল্য পদার্থ!

বলিলেন– ওগো, একটু দেখতে দেবে না? এত দামী জিনিস, একটু দেখাবে না?

লোককান্ত খিড়কির দুয়ারে দাঁড়াইয়া বলিলেন– না, মেয়েমানুষ, তোমাদের বিশ্বাস কী? বলে বেড়াবার জন্য জিভ সুড় সুড় করছে হয়তো। শাস্ত্রে বলে দুষ্কুলা নারীকে বিশ্বাস করবে না।

জয়শীলা ফোঁস করিয়া উঠিয়া বলিলেন– কীইই, আমি দুষ্কুলা? কী না কী চুরি করে এনে এই রাতে পুঁততে চলেছ, সকালে আবার তুলে এনে ঘরে পুরবে। পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে এই কাজ করছ। বললাম বলে আমি হলাম দুষ্কুলা, তুমি কোন সুকুল থেকে এসেছ তাই শুনি? বল ওটা কী, নইলে চেঁচিয়ে পাড়াপড়শী জড় করব।

ত্রস্ত্ব চকিত স্বামী ততক্ষণে কোদাল হাতে অদৃশ্য হইয়াছেন।

প্রাচী নদীর জলপ্রাহের সঙ্গে কোদাল খোঁড়ার শব্দ মিশিয়া গিয়াছিল। মাটি কিছু কঠিন হইয়া থাকিবে, কারণ লোককান্তের মাংসপেশীতে ব্যথা ধরিতেছিল। অবশেষে কাজটা সারিয়া তিনি যখন সিধা হইয়া দাঁড়াইলেন তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইয়া আসিল সোয়াস্তির স্বর– আঃ! হ্যাঁ, একটা চিহ্ন দিয়ে দিই জায়গাটায়।

পুরী শহরের পথুরিআসাহির প্রসিদ্ধ পাথর কাটা কারিগর সারথি মহাপাত্র বাড়ির ভিতরকার বারান্দায় হাত্নপা গুটাইয়া বসিয়া কী ভাবিতেছিলেন। দু'এক ঘণ্টা নয়, সেই কখন হইতে তিনি এমনি বসিয়া আছেন। তাঁর কন্যা শেফালী তিনবার উঁকি মারিয়া দেখিয়া গেছে। বাবা বসিয়া আছেন নির্বিকল্প সমাধিতে।

– মা গো, বাবা কখন থেকে চোখ বুজে বসে আছেন। আমি ডাকলাম, তাও সাড়া দিলেন না। চুনা পাথরের কোণার্কের ঘোড়া নিতে নট্টুঅ ভাই কোন খদ্দের এনেছে। বাবা উঠলে না দরদাম ঠিক করবেন? তা, শুনছেন না তো।

শেফালী সারথির আদুরে মেয়ে। পা দাপাইয়া কথা বলে, কথার তালে পায়ের তাল মিলিয়া যায়। সবল ঋজু শরীর, বাড়িয়া উঠিয়াছে বলিষ্ঠ অঙ্গ লইয়া। ফুরফুরে চুলগুলি মুখের উপর দিয়া আসিয়া পড়িয়াছে।

সারথির স্ত্রী ভিতর হইতে গলা চড়াইয়া বলিলেন– শেফী, বাবা বুঝি কারিগরী কথা কিছু ভাবছেন। এমন কত সময় বসে থাকেন। একটা কিছু ঠিকমত মনে না আসা অবধি এমনি বসে থাকবেন। মনে একবার এসে গেলে হাসতে হাসতে উঠে পাথর একখানা টেনে নিয়ে ঠুকঠাক শুরু করবেন। আজ তো এ নতুন নয়। যা, নট্টুঅ ভাই কে বলগে পঞ্চাশ টাকার কমে কোণার্কের ঘোড়ার মূর্তি বিক্রি হবে না। দুশো টাকার কাজ পঞ্চাশ টাকায় দেওয়া হচ্ছে, টানাটানি চলেছে বলেই না! খদ্দেরট্টুবা কই?

শেফালী 'আচ্ছা মা' বলিয়া বাহিরের দিকে ছুটিল।

সারথি ধ্যানস্তিমিত নয়ন খুলিয়া চারিদিকে চাহিলেন। তাঁর বড় আশ্চর্য বোধ হইতেছে– এ কেমন ফরমাশ। দীর্ঘ পঁচিশ বছরের শিল্পীজীবনে এমন কথা তো তিনি কখনও শোনেন নাই!

লোকেরা আসিয়াছে– ওড়িশার ভিতর হইতে, বাহির হইতে, বিশেষত বাহির হইতে, ফরমাশ করিয়াছে নানারকম মূর্তি, কিন্তু প্রত্যেকটি পূর্ণাঙ্গ। অথচ এই ভদ্রলোক অগ্রিম দশটি টাকা দিয়া বলিতেছেন একটি অবলোকিতেশ্বর মূর্তি গড়িয়া দিতে, কিন্তু...

– মহাপাত্র মশায়, 'না' বলবেন না, এই দশটাকা আগাম রইল। অবলোকিতেশ্বর মূর্তিটি পূর্ণাঙ্গ হবে না, একটি পা আর একটি হাত এমনভাবে ভাঙা থাকা চাই দেখলে যাতে মনে হয় যে কালপ্রভাবেই মূর্তিটি খণ্ডিত হস্তপদ। এই খুঁতটুকু এমনভাবে কাটবেন যে জেনেশুনে তা ভেঙে দেওয়া হয়েছে বা অপূর্ণ রাখা হয়েছে এমন যেন মনে না হয়।

সারথি বিস্মিত হইয়াছিলেন। অভিনব অনুরোধ বটে! শিল্পী খণ্ডিত মূর্তি গড়িয়া দিবে অর্থের বিনিময়ে।

অবশেষে সারথি হার মানিয়াছিলেন। দ্বিধাগ্রস্ত মনে হস্তপদখণ্ডিত একটি অবলোকিতেশ্বর মূর্তি গড়িয়া দিয়াছিলেন। কালপারাবারের প্রতি বিন্দুতে বহু অবলোকিতেশ্বর বহু বুদ্ধ ও প্রজ্ঞাপারমিতা মূর্তি ভাসিয়া গিয়াছে। নিশ্চিহ্ন বিস্মৃতিতে সারথি আজ দেহাবশেষ রাখিয়া গিয়াছেন। পথুরিআসাহি আজ সাহিমাত্র। সে শিল্পময় ধ্যানদৃষ্টি সে সাধনা ও কল্পনা আজকালের ঘন তমশায় অবলুপ্ত।

গ্রন্থাগারের কর্মচারী শঙ্কিত বিহ্বল দৃষ্টি মেলিয়া ব্যাপারটা বুঝিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেও চোখ দুইটা ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে মনে হইল তাঁর।

শহরের প্রখ্যাত গ্রন্থাগার– কেবল প্রখ্যাত নয়, পুরাতন। সেই গ্রন্থাগারের ভিতরে দুই জনের মধ্যে নিম্নলিখিত রূপ কথাবার্তা চলিতেছিল। সময় রাত এগারটা। পাঠকেরা চলিয়া গিয়াছে।

– না না, এ হতে পারে না।

– কেন হতে পারে না? দেশের জন্যেই তো আমি এসব সংগ্রহ করছি, গবেষণার মত এক পবিত্র কাজের ভার নিয়েছি। এ পথে কেউবা পা বাড়ি য়েছেন এর আগে? কেউ না। আমিই একা। কাজেই আমার প্রস্তাবে আপনি রাজি হলে আমি যে মোটা টাকাটা গবেষণার জন্য পেয়েছি তার কিছু আপনাকে দেব। আমার বেশি দরকার কতকগুলি অতি পুরাতন সংখ্যা, আর সেই সব সংখ্যার আর কোনও কপি যেন দ্বিতীয় ব্যক্তির হস্তগত না হয়। তবে এই কথা রইল। কাল রাত বারোটায় আসব। আপনি লাইব্রেরি খুলে রাখবেন। সব খুলবেন না, একটা দরজা শুধু। আমি একটা গরম্নর গাড়ি নিয়ে আসব।

– হ্যাঁ, গরুর গাড়ি? –কর্মচারীটি শিহরিয়া উঠিলেন। গরম্নর গাড়ি কি হবে?

ভদ্রলোক বলিলেন– তা নয় তো কি আমি একখানি দু'খানির জন্য এসেছি? আমি চাই এই সুপ্রাচীন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লাইব্রেরির সমরু সংবাদপত্র অপহরণ করে স্লেস বের মালিক হতে। স্লেস বের মধ্যে যা কিছু আছে তার উপর গবেষণা করে প্রবন্ধ ছাপাব। আর যা কিছু নেই তাও উলটো দিক থেকে 'এষণাগব' করে ছাপাব। আর কারু কাছে কিছু থাকলে তবে তো প্রতিবাদ করবে? বুঝলেন তো, এই জন্যই গরুর গাড়ি আনব।

কর্মচারীর দুই চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইবার উপক্রম। একশো টাকার লোভ ছাড়া যায় না। তাছাড়া কেউবা কেন সেই সকল মলিন কীটদষ্ট পুরাতন খবরের কাগজ পড়িতে আসিবে? এমন লক্ষ্মীছাড়া, অন্য কাজে অপটু কয়জন আছে? তবে গরুর গাড়ি আনিয়া বস্তা বোঝাই করিয়া কাগজ পাচার করার সময়ে ধরা পড়িয়া মাতুলালয় দর্শন সার না হয়! বরং অন্য উপায় আছে।

কর্মচারী বলিলেন– দেখুন, গরুর গাড়ি বা মোটার লরির কথা বাদ দিয়ে আপনি বরং রোজ রাত্রে একটি রিকশা নিয়ে আসুন। চারটি রাতে চারটি রিকশাতেই সব চলে যাবে।

প্রস্তাবটা গবেষকের পছন্দসই মনে হইল। তিনি রাজি হইলেন। বাহাদুরি করিয়া বলিলেন– বন্ধু, এ তো খবরের কাগজ। বড় বড় তথ্যসংবলিত গ্রন্থ থেকে বহু পৃষ্ঠা ছিঁড়ে নিয়ে এসেছি। জ্ঞানের প্রসার ও দেশের ধারাবাহিক ইতিহাস লেখার জন্য এ চৌর্য অপরাধ নয়। সে সম্বন্ধে আমার কনশেন্স ক্লিয়ার আছে।

কর্মচারী প্রার্থনা জানাইলেন– আর কুড়িটি টাকা বাড়াবেন না?

গবেষক চিন্তা করিয়া বলিলেন– দেখুন, এতে আমার আর্থিক লাভ নেই। আচ্ছা বেশ, আর দশটা টাকা বেশি দিতে পারি। একশো দশ বুঝলেন?

চারিদিকে ছাত্রেরা বসিয়া। গগনবাবু একটি বইয়ের কতকগুলি কপি তাদের ধরাইয়া দিয়াছেন। ছাত্রগণ কর্মনিরত।

গগনবাবু উৎসাহ দিয়া বলিলেন– বেশ, এবার আরম্ভ কর। গোন–।

একজন ছাত্র বলিল– কোন অক্ষরটা?

– আমার নামের প্রথমে যে অক্ষরটা আছে, 'গগনবিহারী'র গ অক্ষর।

অন্য এক ছাত্র বলিল– আজ্ঞে, ছয়শো পৃষ্ঠার বইয়ের ভিতর গ অক্ষর কতবার আছে তার অন্ত নেই। তবে এমন মহৎ কাজে যখন আপনি ব্রতী হয়েছেন এবং এই অক্ষর গণনা প্রক্রিয়ার ভিতরে আপনার পাণ্ডিত্য ও ভূয়োদর্শন প্রকাশ পাবে বলে যখন আপনি মনে করছেন তখন আমরা এ কাজ করব। আপনি এই অক্ষরগণনা নি য়ে কী করবেন?

গগনবিহারী হাসিয়া বলিলেন– আরে মূর্খ, কবি কতবার গ অক্ষর প্রয়োগ করেছেন প্রথমে তা বলে নিয়ে তারপর কেন গ অক্ষর প্রয়োগ করেছেন সেই গবেষণা করব। অতএব তোমরা গোন।

একটি রসিক ছাত্র গণন্মর সের ভয়াবহতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া করজোড়ে নিবেদন করিল– আজ্ঞে, এ বড়

কর্মচারীর দুই চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইবার উপক্রম। একশো টাকার লোভ ছাড়া যায় না। তাছাড়া কেউবা কেন সেই সকল মলিন কীটদষ্ট পুরাতন খবরের কাগজ পড়িতে আসিবে? এমন লক্ষ্মীছাড়া, অন্য কাজে অপটু কয়জন আছে? তবে গরুর গাড়ি আনিয়া বস্তা বোঝাই করিয়া কাগজ পাচার করার সময়ে ধরা পড়িয়া মাতুলালয় দর্শন সার না হয়! বরং অন্য উপায় আছে। কর্মচারী বলিলেন– দেখুন, গরুর গাড়ি বা মোটার লরির কথা বাদ দিয়ে আপনি বরং রোজ রাত্রে একটি রিকশা নিয়ে আসুন।

প্রথম জন চামড়ার ব্যাগ খুলিয়া বাহির করিলেন একখানি নিমন্ত্রণ পত্র। বলিলেন– বন্ধু, তোমায় মনে মনে খুঁজছিলাম। এই নিমন্ত্রণপত্র নাও। নিশ্চয় আসবে। প্রাচী উপত্যকায় বৌদ্ধ সংস্কৃতির আভাস পেয়েছি। গবেষকের সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে আমি যা বুঝছি প্রাচী নদীর ধারে যে চাকুন্দে গাছটি ডালপালা মেলে দাঁড়িয়ে আছে তারই নীচে আছে বৌদ্ধ বিহার। আর ঐ চাকুন্দে গাছের বয়স প্রায় দশ বছর হবে।

সাংঘাতিক কাজ। তবে আপনি আগে এই শুভকাজে মঙ্গলাচরণ করুন। চ বর্গের তৃতীয় অক্ষর, ব্লঅ ক্ষরের পরের অক্ষর, ক্লব র্গের দ্বিতীয় অক্ষরে আকার দি য়ে যা হয়– আনান।

গবেষক হিসাব করিয়া দেখিলেন যে সাতটি ছাত্রের উদরপূর্তি ও রসনাতৃপ্তির জন্য আট আনা করিয়া সাড়ে তিনটি টাকা খরচ হইবে। তা হোক, গবেষণার কাজ তো আগাইবে। ডাকিলেন– পরমা, সাড়ে তিন টাকার জলখাবার আনবি, যা– শিগগির যা।

বাস হইতে দুইজন নামিলেন। বাসের ভিতরে একে অন্যকে লক্ষ্য করেন নাই, বাহিরে আসিয়া পরম প্রীতিভরে কোলাকূলি করিলেন। একজন বলিলেন– কেমন চলেছে?

উত্তর পাইলেন– ভালই। তুমি ভূগর্ভবাসী, আমি কাগজের পোকা। আর একজন সে কেবল গণনায় ব্যাপৃত। কোষ্ঠীগণনা নয়, অক্ষর গণনা। এই তিনজনকে বাদ দিলে প্রত্নতাত্ত্বিক আর কেউ নেই।

প্রথম জন চামড়ার ব্যাগ খুলিয়া বাহির করিলেন একখানি নিমন্ত্রণ পত্র। বলিলেন– বন্ধু, তোমায় মনে মনে খুঁজছিলাম। এই নিমন্ত্রণপত্র নাও। নিশ্চয় আসবে। প্রাচী উপত্যকায় বৌদ্ধ সংস্কৃতির আভাস পেয়েছি। গবেষকের সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে আমি যা বুঝছি প্রাচী নদীর ধারে যে চাকুন্দে গাছটি ডালপালা মেলে দাঁড়িয়ে আছে তারই নীচে আছে বৌদ্ধ বিহার। আর ঐ চাকুন্দে গাছের বয়স প্রায় দশ বছর হবে। কারণ দশ বছর আগে... না থাক, এমনি বাস্ল স্টপের কাছে দাঁড়িয়ে এ সব প্রাচীন তত্ত্ব বলতে পারব না। একটি ছোটখাট উৎসবের আয়োজন করেছি। মিউজিয়ম থেকে কিছু টাকা পাওয়া গেছে। দেশের বহু ইতিহাসবেত্তা আসবেন, তাঁদের সামনে আমি যুগযুগান্তের যবনিকা উন্মোচন করে দেখিয়ে দেব যে প্রাচী উপত্যকায় বৌদ্ধ সংস্কৃতি বিদ্যমান ছিল। আমি তা সকলের গোচরে আনব। এই আমার বহু বিনিদ্র রজনীর গবেষণার ফল।

অপরজন উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন– সাবাস বন্ধু! আর আমি কী করেছি জান? আমিও দেখিয়ে দেব আমাদের সাহিত্যের দিকপালেরা কে কেমন ডায়েরি রেখে গেছেন, আর সে ডায়েরি আমি ছাড়া আর কারও কাছে নেই। বড় বড় সাহিত্যিকেরা কোথা থেকে ইন্‌স্পিরেশন পেয়েছেন জান? এ তথ্য আর কেউ জানে না।

প্রথম জন বলিলেন– কোত্থেকে?

– পায়খানায় বসে থেকে! পুরনো খবরকাগজের মধ্যে এই সত্য নিহিত রয়েছে। কেউ পড়ে না দেখে আমি–

– বাঃ চমৎকার! সত্যিই কি এ কথা ছাপা হয়েছে না তুমি গবেষকের দৃষ্টি দিয়ে জানতে পারলে?

– ছাপা আছাপা সব আমাদের বুঝে নিতে হয়। রাধানাথ, ফকীরমোহন ও গঙ্গাধর কাব্য উপন্যাস সৃষ্টি করবার বেগ পেয়েছিলেন বাহ্যকৃত্যের বেগ থেকে। এখনি সব কথা আমি প্রকাশ করে বলব না। রাধানাথের 'ঊষা', 'চন্দ্রভাগা', 'ঋষিপ্রাণে দেবাবতরণ', ফকীরমোহনের 'রেবতী', 'মঙ্গরাজ'– এ সব সেই স্থান থেকেই এসেছে। তাঁদের ডায়েরির ভিতরে তাঁরাই এ কথা বলে গেছেন।

বৌদ্ধ সংস্কৃতির গবেষক প্রাচীন খবরের কাগজের মালিককে প্রীতি আলিঙ্গনে চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন– সাবাস্! আমরা তিনজনে দেশ ও জাতির জন্য যে কী অসাধ্য সাধন করছি তা দেশ এখন বুঝলেই হয়! আচ্ছা, তবে আসি– বলিয়া তিনি বিদায় নিলেন।

সেদিন রাত্রি দুইটার সময় পুরাতন কাগজের মালিক লিখিতেছিলেন– 'প্রিস্টার সাহেব ১৯০৩ সালের ১৩ই জুন তারিখের বেলা চারিটা বাজিয়া পাঁচ মিনিট আড়াই সেকেন্ড সময়ে বাথরুমে বসিয়া ভাবিতেছিলেন যে শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় যে ওড়িয়া ব্যাকরণ ছাপা হইতেছিল তাহা শেষ হইয়াছে।

'ফকীরমোহনের কাঠের গুদামঘরে কাঠ চাপা পড়িয়া যে আজিন্না সাপটি ছটফট করিয়া মারা গিয়াছিল তার প্রেতাত্মা আসিয়া ফকীরমোহনকে বলিয়াছিল যে তিনিও ওড়িয়া সাহিত্য ও ভাষার জন্য তেমনি ছটফট করিবেন ও ১৯৫৯ সা লের গবেষক মহাশয়ের গুদামে চাপা পড়িয়া ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িবেন।

'রাধানাথ রায়ের ভার্গবী নদীতীর হইতে দুই মাইল বাইশ গজ আধ ফুট সাড়ে তিন ইঞ্চি দূরে অবস্থিত একটি এল পি স্কুল উদ্ঘাটন করিবার সময়ে ভয়ানক কাশি উঠিয়াছিল। এই বিষয়টি তাঁহার 'মহাযাত্রা'র ভাবটিকে প্রাঞ্জল করিবে।

'কুন্তলাকুমারী পূর্বজন্মে অগ্নিমান্দ্য রোগে বিশেষ পীড়িত হওয়ায় এ জন্মে প্রতিশোধমানসে তাঁর কবিতায় কেবলই অগ্নিবর্ষণ করিয়াছেন। এই তথ্যটিকে তাঁহার কাব্য বিচারে লাগাইলে ওড়িয়া সাহিত্যে তাঁহার স্থান প্রাঞ্জল হইবে।

'নিআঁ খুণ্টা'র 'ডামরা কাউ' (দাঁড় কাক) নন্দকিশোরের 'ডামরা কাউ'এর পূর্বসুরী। উভয় ডামরা কাউ কতদূর উড়িতে পারিত ও কোথায় 'তিনি মঞ্জিকা' ও 'কউড়ি গণা' দেখিত তার একটি তুলনামূলক সমীক্ষা শীঘ্রই প্রকাশিত হইতেছে।

'সম্বলপুর হইতে রওনা হইয়া হাঁটিতে হাঁটিতে শ্রান্ত হইয়া বসিয়া পড়িয়া গঙ্গাধর আম গাছের তলা হইতে একটি টকটকে লাল আম কুড়াইয়া খাইয়া থাকায় তাঁহার সমস্ত কাব্য ও কবিতা রসাল হইয়াছিল। সেদিন তাঁহার উপবাস ছিল, তথাপি তিনি লোভ সামলাইতে পারেন নাই।'

হঠাৎ গবেষক কোন বিঘ্ন অনুভব করিলেন, তাঁহার লেখনী স্তব্ধ হইল। বিঘ্ন আর কিছুই না, তাঁহার স্ত্রী রত্নমালী।

– ওগো শুনছ?

– কি?

– ও ছাল্লপাঁশ কী লিখছ?

– কেন? ও, তুমি এসে সব পড়ছ বুঝি। খবরদার, ছাল্লপাঁশ কি আর কিছু দেশবাসী বেশি বোঝে। এটুকু না হলে যত বড় আর বিশেষ লেখক হোন না কেন, তাঁদের লেখার রস পরিস্ফুট হবে না।

– তাই নাকি? দশম শ্রেণী অবধি পড়েছিলাম। আমাদের পণ্ডিতমশাই ভক্তচরণ আম খেতেন কি কাঁঠাল খেতেন তা বলতেন না, কিন্তু 'আরে বাবু শ্যাম্লঅ খন্নঅ ' ছান্দটি দুবার এমন করুণভাবে পড়তেন যে আমাদের চোখ থেকে টপ টপ করে জল পড়ত। তাঁর পড়াবার ভঙ্গী এত চমৎকার ছিল, এত মধুর, এত করুণ; তা কই কারও অগ্নিমান্দ্য রোগ ছিল কি না তা তো কখনও বলতেন না!

গবেষক বলিলেন– আহা, তখন কি গবেষণা হত? আজ না সে পথ খুলেছে। যাও যাও, দশম শ্রেণীতে কী দু'পাত পড়েছিলেন তাই– সাহস দেখ একবার! সমস্ত পুরনো কাগজের একমাত্র মালিককে জবাব দেওয়া হচ্ছে!

– ওগো শোন, এ তুষের চাষ করছ কেন? এসব কারা পড়ে? রাধানাথের কাশি উঠেছিল বলে 'মহাযাত্রা' প্রাঞ্জল হয়ে গেল? শোন গো–

– বল না, কী?

– তুমি এসব ছেড়ে কবিতা লেখ গো। জীবনের কত আবেগ কত

উচ্ছ্বাস ফুটবে তাতে।

– কী বললে? কবিতা লিখব? বলি, আমি পুরুষমানুষ না মেয়েমানুষ? না ঐ মেনীমুখোদের মত নরম নরম ন্যাকা ন্যাকা কবিতা লিখব?

– ওগো শোন, নয়তো উপন্যাস লেখ একটা। মানুষের জীবনের কত কথা, কত ব্যথা, আনন্দ, কত কী আছে তাতে। কত রসাল, কত করুণ। লেখ না গো, একটা উপন্যাস লেখ।

– থাম রত্নমালী। আমি জীবনে কখনো গল্প উপন্যাস পড়িনি, লেখা তো দূরে থাক। বুড়ী আই গল্প বলে, বুড়োরা গল্প করে। অশিক্ষিত লোক গাঁয়ের পথে ঘাটে গল্প করতে করতে যায়। এরা হল গপ্পে। এরা আর কিছু জানে না বলে গল্প উপন্যাস লেখে। ছি ছি–

– শোন গো, কত মনের প্রাণের কথা ওরা জানে বল তো? তোমার লেখা পড়ে কারো কখনো চোখ ছল ছল করে উঠবে? কিন্তু ওদের লেখা পড়লে কত ভাব কত আনন্দ মনে আসে। অমনি লেখ না গো!

– রত্নমালী, আমায় বিরক্ত কোরো না। আমি ঐসব করতে গেলে আর দু'জন এগিয়ে যাবে, আমি পিছিয়ে পড়ব। একজন মাটির নিচেকার কথা জানতে পারছে। খোঁড়া নেই খুঁড়ি নেই সে বলছে প্রাচী নদীর উপত্যকায় বৌদ্ধ সংস্কৃতি চাপা পড়ে আছে। আর একজন সে বইয়ের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট অক্ষর কবার পাওয়া যায় আর তা কেন এত বার লেখা হয়েছে এই নিয়ে গবেষণা করছে। এরা অমর হয়ে যাবে, রত্নমালী। আর আমি যদি তোমার ঐ মেয়েলি কথা শুনে ঐ সব হাস্নি কান্না বিরহ্নমিলনকথা লিখ তে বসি তবে আমি মরে গেলে আমার কথা কারও মনেই পড়বে না। তুমি যাও তো, দশম শ্রেণীর বিদ্যে আর জাহির কোরো না। বরঞ্চ শ্যাম্নঅ খন্নঅ গায়ন প দ্ধতিতে তোমার ছেলে কেশবানন্দকে আদর সোহাগ করে চোখের জল ফেল গে, যাও।

বিরাট এক শামিয়ানার নিচে দেশের সুধী পণ্ডিত গবেষক ঐতিহাসিকগণ উপস্থিত। প্রাচী নদী তরুণী বধূর ন্যায় এত জনসমাগম দেখিয়া ফিক ফিক করিয়া হাসিয়া বহিয়া যাইতেছে। আজ দেশের শ্রেষ্ঠ গবেষক রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দেখাইয়া দিবেন যে একদা প্রাচী নদীর তটে বৌদ্ধ সংস্কৃতি ছিল– হাজার হাজার বৎসর আগে।

কাঠুরিয়ারা চাকুন্দে গাছটা কাটিয়া ফেলিয়া দিল, খনন কার্য চলিল। এদিকে পাবলিসিটি ভ্যান হইতে রেকর্ড বাজানো হইতেছিল। চায়ের ব্যবস্থাও ছিল।

গবেষক লোককান্ত আশা আনন্দ ও সাফল্যের এক প্রতিমূর্তি। সকলে তাহাকে সম্ভ্রম দেখাইতেছে– সত্য, কী বিরাট গবেষণা! কী আশ্চর্য দিব্যদৃষ্টি ইঁহার।

মোটে দশ হাত খোঁড়ার পরেই কে একজন চিৎকার করিয়া উঠিল– বেরিয়েছে, বেরিয়েছে!

– কি বেরিয়েছে?

– মূর্তি।

– মূর্তি?

– হ্যাঁ, বৌদ্ধমূর্তি।

সকলে যে যার আসন ছাড়িয়া আগাইয়া আসিলেন। স্বেচ্ছাসেবকগণ সেই উদ্বেলিত জনতাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

বহু ফোটোগ্রাফার ক্যামেরা বাগাইয়া প্রস্তুত হইয়া গেলেন।

একজন কে বলিল– অবলোকিতেশ্বর মূর্তি। বাম পাদের অর্ধেক নেই। ডান হাতও খণ্ডিত।

আর একজন বলিল– হবে না? হাজার হাজার বছর আগেকার মূর্তি। মহাকালের যাত্রার বেগে একেবারে ধ্বংস না হয়ে এমনটা যে রয়েছে– মনে হয় প্রাচী নদীর মৃত্তিকাশয্যায় এটি আজ অবধি সুরক্ষিত হয়েছিল।

লোককান্ত তখন গাঁয়ের ভর হওয়া মানুষের মত কেবল টলিতেছিলেন। তিনি স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। একটা সামান্য প্রদেশ ওড়িশা, সেখানে তিনি আর থাকিবেন না। পৃথিবীময় ঘুরিয়া প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান করিবেন। সে জন্য সর্বত্র হইতে তিনি সাহায্য পাইবেন, তা তিনি জানিতেন। তিনি মস্ত লোক হইয়া গেলেন।

প্রাচী নদীর তটে বৌদ্ধ সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল।

পুরীধামে স্বর্গদ্বারের শ্মশানে পথুরিআসাহির শিল্পী সারথি মহাপাত্রের মরদেহ কতকাল আগেই ভস্মীভূত হইয়া গেছে।

বেচারা চাকুন্দে গাছ! অবলোকিতেশ্বরের মাথার উপরে থাকিয়াও সে রক্ষা পাইল না। কাটিয়া ফেলা গাছটা প্রাচী নদীর স্রোতের মুখে ভাসিয়া গেল বড় অবাঞ্ছিত বড় অনাদৃতের মত।

অনুবাদ **জ্যোতিরিন্দ্রমোহন জোয়ার্দার**

লেখক পরিচিতি

পুরী জেলার ছতাবর গ্রামে রাজকিশোরের জন্ম। ছাত্রাবস্থা থেকেই তিনি অভিনয়, সঙ্গীত ও সাহিত্য নিয়ে চর্চা করছেন। পাটনা ও কলকাতা থেকে ইংরেজি ও ওড়িয়া ভাষায় স্নাতকোত্তর হয়েছেন। বর্তমানে ওড়িশা সরকারের শিক্ষা বিভাগের অধ্যাপক। গল্পকার হিসেবে ওড়িয়া সাহিত্যে তিনি ধ্রুপদী রচনাভঙ্গীর অগ্রদূত। তাঁর রচনার বিশিষ্ট শৈলী ওড়িয়া সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য সংযোজন। তাঁর অনেকগুলি গল্প সংকলনের মধ্যে কয়েকটি: 'নীল লহরী', 'বনজ্যোৎস্না', 'মনর মৃণাল', 'জীবন সঙ্গীত' ও 'আদি পুরন্নষ'। তাঁর একটি জনপ্রিয় একাঙ্কিকা সংকলন: 'পঞ্চপল্লব'।

বাংলাদেশভারত
মৈত্রী সমিতি

হোমটাউন প্রজেক্ট, লেভেল # ১৬, সুট # ১৫বি
৮৭ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা১০০০
E-mail: info@bifs.org.bd
b_ifs@yahoo.com
(জিপিও বক্স # ৭৭৫)
ওয়েবসাইট: www.bifs.org.bd

ABSSI
Association of Bangladeshi Students Studied in India

ABSSI
Association of Bangladeshi
Students Studied in India

ভারতে উচ্চশিক্ষা লাভকারী শিক্ষার্থী সমিতি
President: Dr. Dalem Chandra Barman
VC, ASA University, Dhaka
Phone: 01552 334300
Secretary: Shamim Al-Mamun
Phone: 01715 902146

প্রশিক্ষণ

ভারতে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

ভারত সরকার ২০১৪১৫ অর্থ বছরে ভারতীয় কারিগরি ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা (ইন্ডিয়া টেকনিক্যাল এন্ড ইকোনমিক কো অপারেশন্নআইটিইসি) কর্ম সূচির আওতায় প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রস্তাব দিচ্ছে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ৪৮টি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে এসব কোর্সের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের বিষয় যেমন– একাউন্টিং, টেলিযোগাযোগ, ইংরেজি, ব্যবস্থাপনা, গ্রামোন্নয়ন ও অন্যান্য বিশেষায়িত কারিগরি কোর্স। ভারত সরকার ৩৬ মা সের সংক্ষিপ্ত ও মাঝারি মেয়াদি এসব কোর্সের ব্যয়ভার বহন করে।

যোগ্যতা

আবেদনকারীর বয়স ২৫৪৫ বছ রের মধ্যে হবে এবং সরকারি বেসরকারি বিশেষায়িত কোর্সের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কাজে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। সরকারি প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, স্বনামধন্য কর্পোরেট হাউস বা বাণিজ্যিক সংস্থায় কর্মরত ব্যক্তিবর্গ এ কোর্সে প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন। ইংরেজির ব্যবহারিক জ্ঞান অত্যাবশ্যক।

কিভাবে আবেদন করবেন

আবেদনকারীরা কর্মরত সংস্থার সুপারিশপত্রসহ আবেদনপত্র ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকায় পাঠাবেন। সরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তিকে অর্থমন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ বা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুপারিশসহ আবেদনপত্র পাঠাতে হবে। কোর্সের বিস্তারিত বিবরণ এবং আবেদনপত্র নিম্নলিখিত লিঙ্ক থেকে পাওয়া যাবে:

http://itec.mea.gov.in/?pdf2980?000
http://itec.mea.gov.in/?pdf1325?000

লিঙ্কগুলো ভারতীয় হাই কমিশনের ওয়েবসাইট www.hcidhaka.gov.in-এর Education & Training সেকশনেও পাওয়া যাচ্ছে।

যে কোন তথ্যের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন:
fscom@hcidhaka.gov.in

Training Programme in India

The Government of India offers the training courses under the India Technical and Economic Cooperation (ITEC) programme for the year 2014-15. The courses include diverse subjects such as Accounting, Telecommunication, English, Management, Rural Development and other specialized technical courses in over 48 reputed Institutions across India. They are typically short and medium term courses of between 3-6 months duration and are completely sponsored by the Government of India.

Eligibility

The applicants must be between 25-45 years of age and should have 5 years' relevant work experience in the area of specialized course in either Government or in a private organisation. They may belong to Government, Universities, reputed corporate houses or trade bodies. Working knowledge of English is essential.

How to apply

The applicants should forward their applications to the High Commission of India, Dhaka along with a letter of recommendation from the parent organisation of the applicant. Applicants working in the Government must approach the Economic Relations Division (ERD), Ministry of Finance or the Ministry of Foreign Affairs of the Government of Bangladesh for recommending the applications. The details of courses on offer for the year and application forms can be downloaded at the following links :-

http://itec.mea.gov.in/?pdf2980?000

http://itec.mea.gov.in/?pdf1325?000

The links are also available at the website of the High Commission of India at www.hcidhaka.gov.in under the Education & Training section.

Any queries may be addressed to
fscom@hcidhaka.gov.in

ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র

বাড়ি ৩৫, রোড ২৪, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২ ॥ বাড়ি ২৪, সড়ক ২, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৫

১. ১ অক্টোবর ২০১৫ সন্ধ্যায় আইজিসিসি গুলশান মিলনায়তনে শামা রহমানের রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন
২. ৩ অক্টোবর সন্ধ্যায় একই মিলনায়তনে রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা ও প্রাক্তন সংস্কৃতি সচিব রণজিৎ বিশ্বাসের রবীন্দ্রসঙ্গীত ও আবৃত্তি পরিবেশন
৩. ৪ অক্টোবর সন্ধ্যায় একই মিলনায়তনে দিল্লির রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত সংস্থানের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক রাধাবল্লভ ত্রিপাঠীর 'রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত' শীর্ষক বক্তৃতা
৪. ৮ অক্টোবর সন্ধ্যায় একই মিলনায়তনে ড. প্রদীপ কুমার নন্দীর নজরুল সঙ্গীত পরিবেশন
৫. ৯ অক্টোবর সন্ধ্যায় একই মিলনায়তনে গাজী আব্দুল হাকিমের বংশীবাদন
৬. ১৭ অক্টোবর সন্ধ্যায় একই মিলনায়তনে প্রখ্যাত গায়ক ফকির আলমগীরের সঙ্গীত পরিবেশন
৭. ২৩ অক্টোবর সন্ধ্যায় একই মিলনায়তনে মিসেস সালমা আকবরের সঙ্গীত পরিবেশন
৮. ৩০ অক্টোবর সন্ধ্যায় একই মিলনায়তনে সমরজিৎ রায়ের সঙ্গীত পরিবেশন

Regd. No. DA 355 Bharat Bichitra November 2015

सत्यमेव जयते

ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকা

জ্ঞাতব্য তথ্য

ঢাকার ধানমন্ডিতে নতুন আইভিএসি কেন্দ্র

ইন্ডিয়ান ভিসা অ্যাপলিকেশন সেন্টার (আইভিএসি)-এর মাধ্যমে ভারতীয় ভিসা আবেদন গ্রহণের জন্য ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকার স্বীকৃত এজেন্ট এস্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (এসবিআই) আনন্দের সঙ্গে ১জানুয়ারি, ২০১৫ বৃহস্পতিবার থেকে ভিসার আবেদনপত্র গ্রহণ ও বিতরণের জন্য ঢাকায় একটি নতুন আইভিএসি সুবিধাদানের ঘোষণা দিচ্ছে।

ঠিকানা

আইভিএসি কেন্দ্র, বাড়ি ২৪, সড়ক ২, ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৫

কার্যক্রমকাল

রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার– আবেদনপত্র গ্রহণ সকাল ৮.০০টা থেকে দুপুর ১.০০টা।
রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার– আবেদনপত্র বিতরণ বিকাল ৩.০০টা থেকে সন্ধ্যা ৬.০০টা।
আইভিএসি-র সব কেন্দ্রে সব ধরনের ভিসা আবেদন গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশে এখন নিম্নোক্ত আইভিএসি কেন্দ্র বিদ্যমান। এগুলি হচ্ছে: আইভিএসি, গুলশান, ঢাকা ॥ আইভিএসি, মতিঝিল, ঢাকা ॥ আইভিএসি, ধানমন্ডি, ঢাকা (নতুন) ॥ আইভিএসি, চট্টগ্রাম ॥ আইভিএসি, সিলেট আইভিএসি, খুলনা ॥ আইভিএসি, রাজশাহী।
ভিসা আবেদন করার সময় আবেদনকারীদের সঠিক বিভাগ নির্ধারণ করে আবেদন করতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। সব দলিল সঠিক, সম্পূর্ণ ও অবিকল হওয়া চাই। আবেদনকারীদের এজেন্ট ও মধ্যবর্তী মানুষদের ব্যাপারে সতর্ক থাকার এবং এসব ক্ষেত্রে নিকটতম থানা/আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে জানানোর পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। আইভিএসি বাংলাদেশে তার পক্ষে কাজ করার জন্য কোন ব্যক্তি/সংস্থাকে অনুমোদন দেয়নি।

পুনর্নির্ধারিত প্রক্রিয়া ফি

০১.০১.২০১৫ থেকে পুনর্নির্ধারিত ভিসা প্রক্রিয়া ফি নিম্নোক্ত হারে কার্যকর হবে:
১. ঢাকার সব আইভিএসি কেন্দ্র– বাংলাদেশী টাকা ৬০০.০০ ॥ ২. আইভিএসি, চট্টগ্রাম– বাংলাদেশী টাকা ৬০০.০০ ॥ ৩. আইভিএসি, রাজশাহী– বাংলাদেশী টাকা ৬০০.০০ ॥ ৪. আইভিএসি, সিলেট– বাংলাদেশী টাকা ৭০০.০০ ॥ ৫. আইভিএসি, খুলনা– বাংলাদেশী টাকা ৭০০.০০।

আলোকচিত্র আপলোডের নতুন পদ্ধতি:

০১.০১.২০১৫ থেকে বিশেষভাবে কার্যকর, আবেদনকারীদের অনলাইন আবেদনপত্রে দেওয়া নির্ধারিত জায়গায় তাদের আলোকচিত্র স্ক্যান করে আপলোড করতে হবে। স্ক্যানকৃত আলোকচিত্র ছাড়া আবেদনপত্র অসম্পূর্ণ বলে বিবেচিত হবে।

মেডিক্যাল ভিসা

আইভিএসি, গুলশান কেন্দ্রে একটি বিশেষ মেডিক্যাল এমারজেন্সি ভিসা কাউন্টার রয়েছে। ই-টোকেন ছাড়াও আইভিএসি, গুলশান কেন্দ্রে আগে এলে আগে পাবেন ভিত্তিতে মেডিক্যাল এমারজেন্সি ভিসা আবেদন জমা দেওয়া যাবে।

হেল্পলাইনসমূহ

হেল্পলাইন টেলিফোন/ ফ্যাক্স/ ই-মেইলসমূহ: ০০-৮৮-০২ ৮৮৩৩৬৩২২ ॥ ০০-৮৮-০২ ৯৮৯৩০০৬ ॥ ০০-৮৮-০১৭১৩ ৩৮৯৪৯৯
০০-৮৮-০২ ৯৮৬৩২২৯ (ফ্যাক্স) ॥ visahelp@ivacbd.com. আরো সাহায্যের জন্য ই-মেইল: visahelp@hcidhaka.gov.in
ভিসা আবেদন প্রক্রিয়া সংক্রান্ত যে-কোন ধরনের প্রশ্নের জবাব পেতে ভিজিট করুন: http://www.ivacbd.com/faq.php

জনস্বার্থে ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকা কর্তৃক প্রচারিত